আশুতোষ কলেজ
পত্রিকা
'৯৯
সংস্কৃতি
বিজ্ঞান
পরিবেশ
বিশ্বায়ন
প্রগতি
অর্থনীতি
গণতন্ত্র
সমাজতন্ত্র
সমাজ
সন্ত্রাস
বিশ্বশান্তি
নাৎসিবাদ
ফ্যাসিবাদ
বিদ্রোহ
একতা
মুক্তি
মৌলবাদ
প্রতিবাদ

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

স্থাপিত — ১৯১৬

১৯৯৯

৯২, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড,
কলকাতা-৭০০ ০২৬
দূরভাষ : ৪৫৫-৪৫০৪

প্রলয়ঙ্করী প্লাবনে শারদোৎসবের সমস্ত উচ্ছ্বাস
আর অস্তিত্ব যাঁদের বিপন্ন তাঁদের প্রতি গভীর
এবং সক্রিয় সহমর্মিতায় আমরা দায়বদ্ধ।

—সম্পাদকমণ্ডলী

পত্রিকা দপ্তর

উপদেষ্টা	ঃ	অধ্যাপক শ্রী অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)
প্রধান সম্পাদিকা	ঃ	অধ্যাপিকা শ্রীমতি রাইকমল দাশগুপ্ত
কার্যনির্বাহী সম্পাদক	ঃ	সর্বশ্রী পল্লব মুখোপাধ্যায় ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক মণ্ডলী	ঃ	সর্বশ্রী দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় „ অর্ণব দাশগুপ্ত „ স্বাতী দাশগুপ্ত „ রাহুল কানুনগো „ কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়
কর্মাধ্যক্ষ্য	ঃ	শ্রী সজল বসাক
বিশেষ সহযোগিতা	ঃ	সর্বশ্রী অধ্যাপক শ্রী অংশুতোষ খান ও অধ্যাপক শ্রী রমেন্দ্রনাথ দত্ত
পৃষ্ঠা সজ্জা	ঃ	সম্পাদকমণ্ডলী
প্রচ্ছদ	ঃ	শ্রী পল্লব মুখোপাধ্যায়
পরিকল্পনা, বিন্যাস ও প্রয়োগ	ঃ	শ্রী ইন্দ্রজিৎ নারায়ণ
প্রকাশক	ঃ	অধ্যাপক শ্রী অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)
মুদ্রক	ঃ	সৌরভ প্রিন্টার্স ১০/১এ, রাণী শঙ্করী লেন, কলকাতা-৭০০ ০২৬
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	ঃ	সকল অধ্যাপক, অধ্যাপিকাগণ ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ এবং সর্বশ্রী অয়ন সরকার, সোমরাজ ঘোষ, সৌরেন দাস, পার্থ ভট্টাচার্য্য, সর্বজিৎ মজুমদার, সুমিত সাহা, সৌতি বসু, মনীশ সাহা, সঞ্জীব অধিকারী, রাণা সাহা, প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক রায়, অভিষেক ঘোষ, অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়, অভীক ভট্টাচার্য্য, কৌশিক চক্রবর্তী, রবি সিং, সৌম্যেন্দু বন্দোপাধ্যায় ও কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

কিসের ভুলে রেখে গেলে আমার বুকে ব্যথার বাঁশিখানি

কলেজের অধ্যাপকদ্বয়— ঁঅমলকুমার ভট্টাচার্য্য ও

ঁবিমলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (পদার্থবিদ্যা)

কলেজের শিক্ষাকর্মীদ্বয়— ঁসুজিত চট্টোপাধ্যায় ও ঁঅরুণ ঘোষ

এবং

ছাত্রদ্বয়— ঁকুশল চ্যাটার্জী (দ্বাদশ শ্রেণী)

ও ঁইন্দ্রজিৎ বসু (উদ্ভিদবিদ্যা সাম্মানিক)

এঁদের প্রয়াণে আমরা গভীর মর্মাহত, শোকস্তব্ধ।

ঃ তবু অনন্ত জাগে ঃ

যাঁদের সম্পন্ন জীবন ও কর্ম আমাদের
প্রাণিত করেছে গভীরভাবে—

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

নন্দিনী মালিয়া

রঞ্জাবতী সরকার

● ● ●

যাঁদের সাফল্যে আমরা উজ্জীবিত

অমর্ত্য সেন

বিশ্বজিৎ পালিত

জ্যোতির্ময়ী শিকদার

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

লিয়েণ্ডার পেজ

বুলা চৌধুরী

সম্পাদকীয় কলমে

আবারো 'এসেছে শরৎ হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার পরে'। গতবারের মতন এবারের শারদোৎসবেও আমরা স্তম্ভিত, বিচলিত। অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হিংস্র থাবায় আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ অন্ন, বস্ত্র, গৃহহীন। এবারের শারদোৎসবেও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকবে বাংলার বানভাসি মানুষের করুণ দীর্ঘশ্বাস। আমাদের প্রার্থনা দূরে সরে যাক এই বিভীষিকার মত কালো দিনগুলো, ফিরে আসুক আলোর প্লাবন। বিপর্যয়ের আঘাত কাটিয়ে জীবন পুনর্গঠনের কাজে আমরাও তাঁদের সহযোদ্ধা। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে এই সময়োপযোগী চ্যালেঞ্জ গ্রহণের ক্ষমতা রাখে সতর্ক, প্রাণবন্ত, স্পন্দনশীল মননের বার্তাবহ ছাত্র-যুব সমাজ।

'কলেজ পত্রিকা' কথাটা মনে হলেই বুকের মধ্যে ছলাৎ করে ওঠে। সেইসব শৈশব, কৈশোর, পৌগণ্ডের অনাবিল আনন্দ আর করুণ ভীরুতার কথা চোখে ভেসে ওঠে। অনেক রাতে অঙ্কের বই ঠেলে সরিয়ে রেখে একটুকরো কাগজ নিয়ে বসা— কি লেখা যায়, কি লেখা যেতে পারে! সেই যে বড়দের হাত ধরে পুরীর সৈকতে প্রথম ভ্রমণের রোমাঞ্চ, নাকি অঝোরঝরণ, শ্রাবণদিনে জানলা দিয়ে থৈ থৈ পুকুরে বৃষ্টির ঝর্ঝর, ডালে চুপচাপ অন্যমনস্ক মাছরাঙার ডানার গভীর নীলিমা, কিংবা শান্ত দুপুরে অজ পাড়াগাঁয়ের এঁদো পুকুরে গ্রাম্য বালিকার অবাধ সাঁতার, নাকি অজিত পাণ্ডের গলায় শোনা 'তোমার নাম আমার নাম, ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম'এর আকাশভরা আবেগ! কত নষ্ট করা খাতার পাতা, কাটাকুটি, হিজিবিজিতে ছুটন্ত মধ্যরাত! তারপর একদিন কয়েকপাতা লেখা নিয়ে সন্তর্পণে দোতলার স্টাফরুম। বাংলার স্যারের কাছে মাথা নিচু করে বলে ওঠা— স্যার, একটা লেখা, মানে স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য... নোটিশ বেরিয়েছিল। দীর্ঘ সময় প্রতীক্ষার পর ঝকঝকে রঙীন প্রচ্ছদাবৃত তিন-চার ফর্মার ম্যাগাজিন, নিজের নাম আর লেখা ছাপার অক্ষরে দেখবার সেই প্রথম শিহরণ।

সে সব যেন জন্মান্তরের কথা। এখন এখানে এই হাজরার উত্তাল কলকাতার বুকে আশুতোষ কলেজেও কি ছবিটা খুব বেশী বদলে গিয়েছে? এখনো 'কলেজ পত্রিকা' কথাটার একটা যাদু আছে। সবার মধ্যেই কেমন একটা চঞ্চলতা। লিখতে হবে, কিছু একটা লিখতেই হবে। গদ্য, পদ্য, ভ্রমণবৃত্তান্ত যাই হোক না কেন। কবিতা, প্রবন্ধ, সমস্ত কিছুর ভেতর থেকে ফুটে বেরোতে চায় গহন কিছু অনুভব। কেউ কেউ হাতে তুলে দেয় কাব্য-কথা-নিবন্ধ। পড়তে বসে নিমগ্ন হয়ে যাই। কারো কবিতায় সময়ের স্বাক্ষর, যন্ত্রণা, স্বপ্নভঙ্গের বিষাদ কারো বা লেখায় সাফল্যের দীপ্ত উদ্ভাস। কারো লেখায় এই কলেজকে ঘিরে তার নস্টালজিয়া। কোন প্রাক্তনী হয়তো কলেজের উঠোনে দাঁড়িয়ে কিংবা অলিন্দের মাঝে বদলে যাওয়া সময়টাকেই ভালো করে বুঝতে চায়। টুকরো টুকরো লেখা জুড়ে ছড়ানো কত না উজ্জীবন, শপথ, সংগ্রাম, বিষাদ আর যন্ত্রণা। আরো আছে শব্দ সন্ধান কিংবা সেই সব কবিতা যার ছত্রে ছত্রে ক্লোরোফিলের মতন জমে ওঠা কিছু ব্যতিক্রমী অনুভব। ক্রমশঃ কিছুটা ভরে ওঠে গোলাপী রঙের ফাইলটা। কেবল টুকরো টুকরো কাগজ তো নয় এর মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে কত নবীন প্রাণের সজীব উত্তাপ, সৃজনের কত না গূঢ়-গোপন উৎসার, কিংবা প্রতিদিন কলেজ শেষে দোতলার কমনরুমে পত্রিকার লেখা বাছাই করতে করতে ঋতব্রত, দিব্যেন্দু, সজল, অর্ণব, মনীশ, সৌমেন্দ্যুর সঙ্গে জমিয়ে নির্ভেজাল আড্ডা তাও চিরদিন মনে থাকবে। সেইসঙ্গে দিনের পর দিন ম্যাডাম আর.ডি.জির সতর্ক প্রুফ দেখা— সেওতো বিস্মরণহীন হয়ে থাকল। আর এই সব কিছু নিয়ে আজ প্রকাশিত হল সুপ্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী এই কলেজের মুখপত্র— আশুতোষ কলেজ পত্রিকা '৯৯। আমাদের শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন সমস্ত লেখক, পাঠক ও পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে। ডঃ পবিত্রনন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ স্বপন কুমার দাশ ও ডঃ সজল ভট্টাচার্যর ব্যতিক্রমী, অনুভবী প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হয়েছে পত্রিকা। সমস্ত কিছুর নেপথ্যে থেকে পরম সুহৃদের মতন আমাদের সর্বদা উৎসাহ ও সহযোগিতা করেছেন অধ্যাপক শ্রী অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, এ কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা, পত্রিকা স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশ করতে নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছে। প্রিয় পাঠকবর্গের গঠনমূলক সমালোচনা আগামী দিনগুলোর পত্রিকার গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে প্রভূত সাহায্য করবে।

পল্লব মুখোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক,
সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে

সাধারণ সম্পাদকের কলমে

পৃথিবীর কোনো শক্তিই পারে না জীবনের জয়গানকে থামিয়ে দিতে। মানুষের সজীবতার কথা, প্রাণের সর্বজতা আর অনন্ত রক্তিমতার কথা ঢেকে দিতে পারে না কেউ। তাই অনেক প্রতিবন্ধকতা, সীমিত সামর্থকে কাটিয়ে উঠে আমরা সক্ষম হয়েছি এই সুপ্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে। আমাদের সীমিত সামর্থের মধ্যেই আমরা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি সৃষ্টির কথা, অনুভবের কথা, অব্যক্ত যন্ত্রণা আর লাল সূর্যের দিকে ধেয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষার কথা— আমরা বলতে চেয়েছি তেমার কথা, আমার কথা—

আমাদের কথা

এই কথা বলবার প্রক্রিয়ায় যার উপদেশ আমাদের প্রতিপদে সাহায্য করেছে তিনি হলেন আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রীঅমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের কথাগুলোকে নিউজপ্রিন্টের পাতায় রূপ দিতে সর্বাধিক সাহায্য করেছেন আমাদের পত্রিকার প্রধান সম্পাদিকা অধ্যাপিকা শ্রীমতি রাইকমল দাশগুপ্ত এবং ইংরেজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীরমেন্দ্রনাথ দত্ত। এছাড়াও অধ্যাপক অধ্যাপিকারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে রকম সাহায্য করেছেন সেই রকম সাহায্য না পেলে পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভবপর হত না। কলেজের শিক্ষাকর্মীদের সহায়তাও অনস্বীকার্য।

বিগত একটা বছর ধরে আশুতোষ কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল আমরা বিশ্বাস করি যে আগামী দিনেও ঠিক সেইভাবে ছাত্রসমাজ আমাদের পাশে থাকবে। নবীনবরণ উৎসবের অনুভবে, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উৎসাহে, সরস্বতী পূজোর স্নিগ্ধতায়, কমনরুম ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্দীপনায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলায় অন্য কলেজের জালে বল জড়িয়ে যাওয়ার উদ্দামতায়, দাবী আদায়ের দৃপ্ত মিছিলে যেরকমভাবে ছাত্রছাত্রীরা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে তাতে এক কথায় আমরা অভিভূত। এই প্রসঙ্গে সংসদের সকল সদস্য, সদস্যা সহ কলেজের সমস্ত ছাত্র ছাত্রীর প্রত্যক্ষ আন্তরিক সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। আমরা আশাবাদী যে নতুন শতকে আমরা সবাই মিলে গড়ে তুলব এক নতুন ছাত্রসমাজ, যে ছাত্রসমাজ নতুন সূর্যের কথা শোনাবে, শোনাবে নতুন দিনের গান।

অভিনন্দন সহ,
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক
আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ

"পোষমানাকে অস্বীকার করো,
অস্বীকার করো বশ্যতাকে।
চলো, শুকনো হাড়ের বদলে
সন্ধান করি তাজা রক্তের,
তৈরী হোক লাল আগুনে ঝলসানো আমাদের খাদ্য।
শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গজিয়ে উঠুক
সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘারে।

—সুকান্ত

আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ, ১৯৯৮-৯৯

সভাপতি
অধ্যাপক শ্রীঅংশুতোষ খান

সহ-সভাপতি
শ্রীসুপ্রিয় বেদজ্ঞ

সাধারণ সম্পাদক
শ্রীঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগ্ম সহ-সাধারণ সম্পাদক
শ্রীসৌরেণ দাস
শ্রীসোমরাজ ঘোষ

যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক
শ্রীমতী সৌতি বসু
শ্রীকৌশিক চক্রবর্তী

যুগ্ম সহকারী সাংস্কৃতিক সম্পাদক
শ্রীপ্রিয়ব্রত লাহিড়ী
শ্রীতৃণব্রত দাস

যুগ্ম ক্রীড়া সম্পাদক
শ্রীসুমিতরঞ্জন সাহা
শ্রীসৌরভ মজুমদার

যুগ্ম সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক (বহির্বিভাগ)
শ্রীগোপেশ মজুমদার
শ্রীরাহুল কাননগো

যুগ্ম সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক (অন্তর্বিভাগ)
শ্রীসুদীপ চন্দ্র
শ্রীঅভিরূপ দাশগুপ্ত

যুগ্ম পত্রিকা সম্পাদক
শ্রীদিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅরিজিৎ বসু

যুগ্ম কমনরুম সম্পাদক
শ্রীসঞ্জীব অধিকারী
শ্রীসুদীপ্ত দাস

কমনরুম সম্পাদিকা
শ্রীমতী স্বাতী দাশগুপ্ত

যুগ্ম গ্রন্থাগার সম্পাদক
শ্রীঅর্ণব দাশগুপ্ত
শ্রীমানস ভট্টাচার্য

যুগ্ম ছাত্র উন্নয়ন সম্পাদক
শ্রীসমীর খান
শ্রীসহজ ঘোষাল

ক্যান্টিন সম্পাদক
শ্রীপ্রতীক দাস

যুগ্ম ছাত্রাবাস সম্পাদক
শ্রীকৌশিক কর
শ্রীসুদীপ্ত গাঙ্গুলী

অন্যান্য সদস্য
সর্বশ্রী পার্থ ভট্টাচার্য, অপর্ণা ভট্টাচার্য, শুভাশীষ দে, অর্ধেন্দু সিন্‌হা, সুরজিৎ কুণ্ডু ও সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছাত্রছাত্রীদের প্রতি

এই শতকের গোড়ায় প্রতিষ্ঠিত বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতমূলক সংস্থাগুলির অন্যতম আমাদের আশুতোষ কলেজ। এই কলেজ, এই মহাবিদ্যালয়, আজ তার চুরাশী (৮৪) বছরের প্রবীণত্ব নিয়ে একবিংশ শতকের মুখোমুখী। তার জন্মলগ্নে যেমন ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের উত্তপ্ত পরিবেশের চাপ, তেমনি ছিল দেশের জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনর প্রভাব। বাংলা তথা ভারতের শিক্ষা জগতের অসাধারণ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর আশীর্বাদ নিয়ে যেমন এই কলেজের আবির্ভাব, তেমনি এই শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ রবীন্দ্রনাথ-এর পদধূলিতে কলেজের এই ভবন ধন্য। কলেজ পত্রিকার মতো একটি সাংস্কৃতিক ক্রিয়া সম্পন্ন করতে গিয়ে এই বিষয়গুলো আমাদের স্মরণে আনতে হয়।

শতাব্দীর শেষলগ্নে নতুন কোনও মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা হয়ত দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তাই বলে পৃথিবীতে হিংসাত্মক ক্রিয়া হ্রাস পাচ্ছে এটা বলারও কোনও উপায় নেই। বরং বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে সন্ত্রাসবাদ এবং জাতি গোষ্ঠীর বিবাদ সংঘর্ষ। এই পরিবেশে শিক্ষা সংস্কৃতির জগতে নানাপ্রকার নেতিবাচক ও হতাশাব্যঞ্জক প্রবণতা প্রশ্রয় পাচ্ছে। উপরন্তু সামাজিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধির মতো না হলেও তাঁদের নিকটবর্তী স্তরেরও কোনও ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে না।

এই কঠিন সত্যগুলো আমাদের সকলকে উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষাকর্মীদের সহায়তা ও শুভেচ্ছা নিয়ে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা এই জটিল ও কঠিন পরিবেশে যাবতীয় অসুস্থ প্রবণতাকে প্রতিহত করবে এটাই আশা করব। ঐতিহ্যমণ্ডিত এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজ নিজ শিক্ষা-কর্মসূচীর মধ্যেই নানা সাংস্কৃতিক ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করে এই দায়িত্ব পালন করতে পারে। কলেজ পত্রিকা তারই অন্যতম একটি উপায়। এবারের পত্রিকা সেই দায়িত্ব সম্পাদনে কতটা সফল হল সেই মূল্যায়ন যেমন চলবে, তেমনি আগামী দিনে আরও উন্নত ও বিস্তৃত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে নিজেদের যুক্ত রাখবে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা আরও জরুরী। যারা এই সংখ্যায় লেখক/ লেখিকা এবং যারা কেবল পাঠক / পাঠিকা তারা সকলেই যেন বর্তমান সংখ্যাতেই নিজেদের আবদ্ধ না রেখে ভবিষ্যতের নতুন শতাব্দীর উন্নত ভাবনায় নিজেদের উদ্বুদ্ধ করে।

অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, আশুতোষ কলেজ
প্রকাশক, আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

বিষয়সূচী

কবিতা সঙ্কলন ঃ

কবিতাগুচ্ছ ☐ *সুদীপ্ত দাশগুপ্ত* ... ১
মেঘবৃষ্টির লেখা ☐ *ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়* ... ২
পাঁচ ফুট বাই পাঁচ ফুট ☐ *সম্রাট সেনগুপ্ত* ... ২
স্বপ্ন যন্ত্রণা ☐ *কৌশিক চক্রবর্তী* ... ৩
ধাঁধা ☐ *অরিন্দম রায়চৌধুরী* ... ৩
এই পথ গিয়েছে বেঁকে ☐ *প্রিয়ব্রত আচার্য* ... ৪
এই সময় ☐ *বহ্নিশিখা দে* ... ৪
স্মরণীয় নজরুল ☐ *ভাগ্যধর দাস* ... ৪
স্বাধীনতার প্রতি ☐ *অর্ণব দাশগুপ্ত* ... ৪
স্তব্ধতার গান ☐ *ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়* ... ৫
Cricket is a fun ☐ *অরিন্দম রায়চৌধুরী* ... ৫
You and the Seasons ☐ *পায়েল সেনগুপ্ত* ... ৫
The Silent Mutiny ☐ *সম্বিৎ বসু* ... ৬
Mother ☐ *সবিতা পটনায়ক* ... ৭
Typical Life ☐ *ক্ষুদিরাম মল্লিক* ... ৭
অনুসন্ধান ও প্রাপ্তি ☐ *বুদ্ধদেব হালদার* ... ৪৮
নব ঘোরালেই ☐ *অনিন্দ ঘোষ* ... ৪৮
জীবনানন্দ দাশ ☐ *অনন্য ভট্টাচার্য* ... ৪৯
অন্তরীণ ☐ *অভ্রদীপ মুখার্জী* ... ৪৯
Don't Quit ☐ পারমিতা মুখার্জী ... ৫০

গল্প ঃ

আহত সুর ☐ *সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত* ... ৮
অভিনেতা ☐ *শুভদীপ মজুমদার* ... ১০
পৃথিবী ইঁদুর পরীক্ষা ☐ *সৌমেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়* ... ১৪
মুশকিল আশান ☐ *সংঘমিত্রা চক্রবর্তী* ... ১৬

নির্বাচিত প্রবন্ধ ঃ

নগরজীবনের চালচিত্রে শারদোৎসব— কিছু অনুভব
পল্লব মুখোপাধ্যায় ... ১৮
অভিভাবক এবং সমাজপতিরা শুনছেন কি?
অভিষেক গুহ ... ২১
The True Essence of Womanhood-
Motherhood— the First Act?
তানিয়া শিকদার ... ২৩

বিজ্ঞান প্রসঙ্গে ঃ

ধাতুদূষণ ☐ *স্নেহাশীষ দাস* ... ২৪
Tau Physics ☐ দেবদীপ কর ... ২৫
Before Marriage Blood Test is Very Essential—
A Scientific View ☐ *দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়* ... ২৭
জিনে ক্লোজিং কি ভবিষ্যতে ফ্রাংকেনস্টিন হবে?
ডঃ স্বপনকুমার দাশ ... ৪২
অতল সাগরের কোলাহল
ডঃ পবিত্রনন্দ গঙ্গোপাধ্যায় ... ৪৬
ফিরে আসা পতঙ্গ বাহিত রোগ
ডঃ সজল ভট্টাচার্য ... ৫১

জানা-অজানা ঃ

বার্তাবাহী উদ্ভিদ ও সবচেয়ে মূল্যবান বই
স্নেহাশীষ দাশ ... ৩৩

সমসাময়িক ঃ

Calcutta to 'Kolkata' and
West Bengal to Bangla ☐ *সৌরভ ভট্টাচার্য* ... ৩১

ব্যতিক্রমী অনুভব ঃ

কিছু হারানো দিনের কথা, কিছু আশা
হেরম্ব মৈত্র ... ৩২

সঙ্গীত সংক্রান্ত ঃ

পুজোর গানের সেকাল, একাল ☐ *পরন্তপ* ... ৩৪

জন্মশতবর্ষ স্মরণে ঃ

নজরুলের চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা
পল্লব মুখোপাধ্যায় ... ৩৬

শান্তির স্বপক্ষে ঃ

শান্তি চাই ☐ *অনুজ গঙ্গোপাধ্যায়* ... ৩৯

শব্দসন্ধান ঃ

World Preface ☐ জ্যোতিষ্মান সাহা ... ৪৫

'হেমন্তের দেরি'

সুদীপ্ত দাশগুপ্ত
ভূতত্ত্ববিদ্যা (সাম্মানিক) দ্বিতীয় বর্ষ

আমি রই বহুদূরে দেশে
বনডুমুরের রুক্ষশাখায় নামে অঘ্রাণের কালি
সন্ধ্যে নামে মেঘের মেখলায়
পড়ে থাকে একরাশ ক্লান্তিকর লালরঙের রেখা—
নীলকণ্ঠ উড়ে-যাওয়া দুর্গমের পথ

ক্লান্তির সমাহারে বিচলিত তারায় তারায়
অশ্বত্থে ঢাকে মুখ হতাশ এক কাস্তের ফালি
শূন্যতার অনুভূতি ঢেলা ঢেলা শুক্‌নো মাটিভরা
বহু— পথ
তপ্ত মনে শীতল হিম ঝরেছে চমক
ঘর ছেড়ে উল্টোমুখো হেঁটেছি অনেক
— নিষ্ফল নিরাশ;
এবার বাসাফেরার বেলা
একাকিত্বে বহুপথ পার হয়ে হয়ত
কাকে যেন ফেলেরেখে এতদূর পেরিয়েছিলাম।।

"কবিতারা বিখ্যাত হলে"

সুদীপ্ত দাশগুপ্ত
ভূতত্ত্ববিদ্যা (সাম্মানিক) দ্বিতীয় বর্ষ

কবিতা বিখ্যাত হয় বাজারে বাজারে . . .
তেলচুকচুক্ আঁতেলের বাড়ে কিলোদর
নিরক্ষরতা রাতারাতি বিলুপ্তির পথে
পোকাদের টোকো দাঁতে পড়ে যায় শান্
কবিগণ কুখ্যাত হন পাব্‌লিক প্লেসে;
পাঠকের দাঁত টকে যায়
আলোচক তাল ঠুকে যায়
নতুন গজানো কবি বেমালুম টুকে যায়
ইন্‌টেন্‌সিভকেয়ার থেকে স্বস্তির দীর্ঘতম নিঃশ্বাস ফেলে
প্রকাশক বাড়ি ফিরে বাঁচে।

সব হয়, শুধু—
পড়ে থাকা টুক্‌রো টুক্‌রো কবিতার পাপড়িরদল
ততক্ষণে হয়েগেছে অন্ধকার ছায়া,
কোনও দাড়িওলা আধপাগল কবির চোখে
চেনা কোন ও মেঘেদের ভিড়ে, কিংবা
"আকাশের সবচেয়ে উঁচু তারা" খানি তাঁর
ম্লান ম্লান মনে হল শেষে;
ঠিক তার আগে—
ম্যাগেদের উঁইকরা আবর্জনার স্তূপে
বাসী মড়া দেখে এলুম ধাপার নন্দনে—
হাজারে-হাজারে, অজুতে-অজুতে, লাখে-লাখে . . .
কবিতা বিখ্যাত হলে বাজারীর বাজারে . . .।।

'মেঘ বৃষ্টির লেখা'

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
ইংরেজি (সাম্মানিক) — দ্বিতীয় বর্ষ

"আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
ধান দেব মেপে"
আয় আমার বোন,
ধানের গোলা গোন।
ধান নিয়ে যা
বৃষ্টি দিয়ে যা।
ধানের বোঝা নিয়ে
তুই উঠবি কোথায় গিয়ে?
তুই কোথায় যাবি?
আমায় নিয়ে যাবি!
তোর খোলা চুল,
তাতে হলুদ ফুল—
ওই হলুদ ফুলের দেশে,
যাবি তুই ভেসে।
ভেসে ভেসে দূর—
আরো অনেক দূর
ওই তেপান্তরের ধারে—
তেরো নদীর পারে——
যেথায় সাতসমুদ্র মেশে
ওই স্বপ্নরঙিন দেশে।
দেশের নাম কি?
তুই তো বলিস নি——
তোর স্বপ্নরঙা দেশ
সেথায় হয় যে দুখের শেষ।
সেথায় আছে অনেক আলো
তাই বোন তুই ভালো।
তোর মুখের হাসি
আমি বড়ই ভালবাসি।
ভালবাসার রেশ
হয় কখনও শেষ?
শেষ হয় না,
তবু কেউ জানে না—
জানার নেই শেষ
তোর কালো কেশ।
ওই কালো কেশের পরে
চাঁদ খেলা করে——
ওই চাঁদের মতো রূপ
আমার বোনের মুখ।
ওই মুখের পরে
মুক্ত হাসি ঝরে।
আমার কবিতা
শেষ হয় নি——
আমার বোনের নাম কি?
তার নাম যে সৃজনী।।

পাঁচ ফুট বাই পাঁচ ফুট

সম্রাট সেনগুপ্ত
উদ্ভিদবিদ্যা (সাম্মানিক) — প্রথম বর্ষ

হাওয়ায় দুলছে মোমবাতিটা—
পাঁচ ফুট বাই পাঁচ।
দিনের শেষে ধোঁয়ায় ওড়ে
কাঠ কয়লার আঁচ।
অথবা, যাদের বাসি গোধুলি
শুধু পাঁচ বাই পাঁচ।
দিনের শেষে গন্ধ ভাসে,
গালি গালাজ কর্ণে পশে,
তারই মাঝে পড়তে বসে
অন্ধকারে— ছেলে জনা চার পাঁচ,
তাদের ঘিরে আগলে রাখে
শুধু পাঁচ বাই পাঁচ।
দুঃখ— যাদের বড় ছেলে,
চুরি করে গেছে জেলে;
মা সারাদিন হাড়ভাঙা খাটে
পরের বাড়ির কাজ!
নেশা করে স্বামী— দেখে না কখনো
নব বেহুলার সাজ।
তবু নিশিদিন, ছেলে গোটা তিন
ফুটপাথে করে নাচ।
তারই আশেপাশে, দেঁতো হাসি হাসে।
বহু পাঁচ বাই পাঁচ!

স্বপ্নযন্ত্রনা

কৌশিক চক্রবর্তী
দ্বাদশ শ্রেণী — বিভাগ 'ক'

পথে যেতে যেতে, দেখা হল কবে
স্মৃতির পটেতে সেই ছবি
আজো কাঁদে বারে বারে।
মনে পড়ে হারানো সে দিন,
একফোঁটা রক্তের মতই নির্মম।
অশ্রুসিক্ত আঁখিতে স্বপ্নের রঙিন বোঝাপড়া,
অন্ধকারে পথ হারানোর চেয়েও দুঃসহ।
কত বিরক্তি, কত ঘৃণা অমলিন,
মনে আছে কনলতার সেই মুখ—
যেন রূপসী বাংলার বুকে এককুঁড়ি ফুল
আজও ভাবায় আমাকে।
তবু নিষ্পাপ মনের যন্ত্রণা কে বোঝে?
শতসহস্র প্রতিশ্রুতির উপর দাঁড়িয়ে
কারা যেন ডাকে আমায়;
চিৎকার করে বলতে চায়—
ফিরে এসো জীবনের মাঝে।
তবু ভন্ড এই সমাজব্যবস্থা
দাড়িপাল্লার ওজনে বাধা পড়ে।
বাধা পড়ে জীবন, একইভাবে বয়ে চলে জীবনসমুদ্র,
ক্লান্ত, অবসন্ন মন তখন খোঁজে এককোঁটা জল
তখন অশ্রুসিক্ত আঁখিতে জ্বলে ওঠে
ভবিষ্যতের স্বপ্ন।
মনে হয় পৃথিবীর বুকে যে অনল জ্বেলেছি আমি
আমার বুকেও সেই অনলের রুদ্ধতাপ;
যেন অকারণে চিরে দেয় পাথরের বুক,
শুধু আড়ালে থাকে ভাবলেশহীন এক মুখ—
জীবনানন্দ সে।।

ধাঁধা

অরিন্দম রায়চৌধুরী
অর্থনীতি (সাম্মানিক) — দ্বিতীয় বর্ষ

দুষ্টু এসে
খুকু এসে
বল্ল শেষে
পাশে বসে
শুনবি দাদা
একটা ধাঁধা
পারিস যদি
তবেই পাবি
আমের আচার
মিষ্টি খাবার,
বোকার মত
কথা যদি
বলিস তবে
ভেংচি পাবি।
দাদা বলে
শোনা শুনি
ধাঁধা আমি
ভালই জানি
কঠিন যত
হবে তত
জবাব দেব
শত শত।

"এই পথ গিয়েছে বেঁকে"

প্রিয়ব্রত আচার্য্য

বি.এস্.সি — প্রথম বর্ষ

এই পথ গিয়েছে বেঁকে,
কোথায় কে জানে?
নদীকে সংগে রেখে
দুই বন্ধুর বন্ধুত্বের টানে।
সেই পথের কথায় ভাই,
আজ তোমাদের বলতে চাই।
যে পথ দিয়ে রোজ সকালে,
রামগোয়ালা ও পিওন কাকু চলে।
এই পথের দুধারে গাছ রয়েছে সারিসারি,
কত গাছ! আম, অশ্বত্থ, তাল, সুপারি।
সেই পথের উপর গাছের তলায়,
ক্লান্ত পথিক জিরিয়ে নেয় দুপুর বেলায়।
এই পথের উপর দিয়ে,
গ্রাম্য বধূ যায় কাঁখে কলসি নিয়ে।
আমরাও যাই খেলতে বহু দূরে,
যেখানে নদী চলেছে বহু পথ ঘুরে।
এই পথের উপর হাট বসে প্রতি সোমবারে,
যেখানে নদী বাঁক নিয়েছে ঠিক সেইপারে।
নদীর এপারে সূর্য ওঠে ওপারে ডোবে,
আজ তাহলে এখানেই শেষকরি আবার দেখা হবে।।

এই সময়

বহ্নিশিখা দে

বাংলা (সাম্মানিক) — প্রথম বর্ষ

সহজ নেই আর কোনকিছু
জীবন মণ কথোপকথন
বদলে গেছে যেন অনেক কিছু
হারাবার বেদনা বাড়ছে যেমন
পাবার আশাও কমছে তেমন
সম্পর্ক হচ্ছে শিথিল আর,
বন্ধুত্ব হচ্ছে মলিন
শুকিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতি আর,
পালটে যাচ্ছে নীতি
বাড়ছে কাজের চাপ সাথে কমছে সময়
গল্প-আড্ডা আজ শুধুই স্বপ্নময়।

স্মরণীয় নজরুল

ভাগ্যধর দাস

বি.এস্.সি — প্রথম বর্ষ

বিদ্রোহী কবি তুমি জাতির স্বর।
জাতির উত্থান আয়াস ভাস্বর।।
কলম হস্তে সৈনিক সারা দুনিয়ার।
সাম্যবাদ আখ্যাত ভূ-বিস্তার।।
শৈশব স্মরণ দুর্দিন অকিঞ্চ ন।
যৌবন স্মরি সৈনিক শিহরণ।।
অভি লেখনী বিরুদ্ধ অচ্ছুত।
ব্রিটিশ বিরুদ্ধ লেখনী সৈনিক বিচ্যুত।
হিন্দু, মুসলিম, বুদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান।
তোমার হস্তে মিলন ঐক্যতান।।
লভি স্বাধীনতা যোগারুঢ় যাজক।
ব্রিটিশ দর্প সন্ত্রস্ত ক্ষমা যাচক।।
রণাঙ্গন বাণী ধ্বনিত কলম হস্তে।
ভারত সন্তান জাগ্রত বীর বীরত্বে।।
বঙ্গবাসীর হে রণাঙ্গন বিরোচিত।
সন্তান হৃদয়ে বিদ্রোহ বান বিরচিত।।
শেষান্তে পদযাত্রা অতীব দুঃখ।
শয্যাশায়ী, বধির, বার্ধক্য, মূক।।
শত শত বর্ষ পরে হোক মোহিত।
মোহিত করি পাদপদ্ম ললিত।।

স্বাধীনতার প্রতি

অর্ণব দাশগুপ্ত

প্রাণিবিদ্যা (সাম্মানিক) — প্রথম বর্ষ

স্বাধীনতা তুমি কার!
আমিরের না গরিবের?
নাকি তুমি সবার।
যদি তুমি হতে সবার,

তবে কেন এত হাহাকার?
স্বাধীনতা যদি তুমি যাও চলে
কিন্তু মুষ্টিমেয়র হাতে;
তবে কি জানো
পড়বেনা একবিন্দু চাল
বহু লোকেরই পাতে।
স্বাধীনতা তুমি জেনে রাখো
চুপ করে মোরা নই!
আমরা কিন্তু দু-হাতে,
বিপ্লবেরই বোঝা বই।
স্বাধীনতা তুমি শুনে রাখো
জবাব আমাদের চাই
যদি তুমি কোনো ভুল করো
নিস্তার তোমারও নাই।।

স্তব্ধতার গান

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

ইংরেজি (সাম্মানিক) — দ্বিতীয় বর্ষ

জীবনের পথে ধ্বনিত হয় স্তব্ধতার গান
মন দিয়ে সবাই শোনো সেই তান।
মানুষের আকুল ব্যাথা, নীরবতা প্রান্তিকের পথে
তোমার নিবিড়তা ভেসে বেড়ায় সুবাসে।
জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে কত না কাটাকাটি হানাহানি
তবু, জীবনেরই রঙে আমি ভুলি সেই গ্লানি।
নীল নদীর তীরে শোনা যায় কোকিলের তান,
জীবনের মরা গাঙে আসবেই একদিন বান,
চলো আমরা সবাই গাই শুধুমাত্র স্তব্ধতার গান।
নিঃস্ব আমি,
রিক্ত আমি,
শূণ্য আমি,
আমি জীবনতৃষ্ণায় পান করি স্তব্ধতার গান।
নিঃস্বতা, রিক্ততা, শূণ্যতা নিয়ে কে যাবে কোথায়?
কত দূরে, কত দূরে বন্ধু কোথায় কোথায় কোথায়?
যেখানেই চলে যাও কোনোদিন ভুলো না এ গান—
এই পাগল পৃথিবী তোমারই জন্য চিরকাল
গেয়ে যাবে শুধুমাত্র স্তব্ধতার গান।।

Cricket is a fun

Arindam Roy Chowdhury

Eonomics (Hons) — 2nd Year

Cricket is a fun,
Especially when Sachin is
making a run
It's worth watching cricket
When Srinath is taking a wicket
Wen D'Silva returns on zero,
Ganguly is declared the Hero.
Dickie Bird is in a fix
When Sachin is hitting a six,
When Jadeja is making a four,
Atherton can do nothing to improve
his score!
When by Mongia the Ball is caught
Stewart Sits there rapt in a thought.
When Azhar did not get the cup of cricket.
Cork still wonders
If I had got any wicket.
When Sachin is on the three-digit score
Fair brother can not hit even a single four.
When Ganguly is awarded
The Man of the match
Mahanama is dropping an early catch.
When Jaysurya is not able to
Make a good score
Robin is making a huge score
So in short cricket is a fun
But especially when India has won.

You and the Seasons

Payel Sengupta

Economics (Hons) — 1st Year

The blue sky of the heaven above
Seems to reflect you,

The scorching summer sky
Reveals the everglowing skin of yours,

When my fingers lie
A light touch of you, can make
My earthly emotions die,
And I am left just with you
And your presence that makes me cry,
For more and more of you.

In the cloud-shrouded sky of the rain
I discern you and it makes my heart
bitterly pain,
Your thick mushy hair
And dark eyebrows a pair ;
The clouds remind me of you
The rain ushers many a tear, not a few;
I miss you utterly throughout the rain,
Your image casts a numb shadow or my
brain.

The sky once again shines bright,
The dark clouds fled in utter fright,
of the new sun in the clear sky
Which reminds me of your smiling face
by and by;
Those lips with an upward curl,
Reveal your teeth, a string of pearls,
And how much I desire to come close to
you
And plunge into an esstasy absolutely
new!

The Silent Mutiny

Sambit Basu
Physics (Hons) — 2nd Year

The Sky was overcast with clouds
As I stepped into the graveyard,
Every-thing seemed to be dismal to me
Even the chirps of bird.

The flowers have dried away,
The obelisk covered with moss;
My beloved friend is no more
in the world,
I can not bear the loss.

He was a man of golden heart,
With a soul as pure as truth
Sufferings of people, human sorrow,
Is all which he liked to soothe.

He was a man with great ideal,
Against injustice he used to protest;
Alas! These were his greatest faults
And these forced him forever to rest.

The holy cross has cracked away,
And his grave is covered with dirt,
But nourished by his evergreen
thought—
Green Grasses grow over his heart.

I feel his presence every now and then;
His memories make me sob;
Every time I light a candle
The cruel wind blows it off.

Suddenly everything stopped;
The wind the scoreech owl's scream
Even the leaves of the trees stopped
moving
Silence reigned supreme.

The lightening cracked through the dark
sky
But I could hear no thunderbolt,
His grave was lit up with a natural blaze
My conscience began to rebolt.
The dormant volcano will errupt one day,
Demolishing the evil power;
And light an eternal frame on the earth
In the darkest hour.

Mother

Sabita Patnaik
History (Hons.) — 1st Year

She was the first person to hold my hand
To Kiss me, to bless me
Help me to stand
She was the first person to correct me
When I was wrong;
To cuddle me, to hug me
Puzzle me with her song.
She was the first person to snatch away,
My tears,
To touch me, to praise me,
make me smile through my tears
She was the first person
To share my dreams and joys;
To teach me, to tell me
And give me lots of toys.
She was the first person
To take me to the "land of wonder",
To love me, to cheer me
And protect me from thunders.
She was the first person
To give me her power
To take me, to be with me
Share my thoughts in
each and every hour.

"Typical Life"

Khudiram Mallick
B. A. — 1st Year

You will go back, Nothing will remain—
You will go back after coming for a
moment;
you will set out for the heaven—
Only a handful of ash will remain;
And you will be alive in my heart.
There is no sorrow or cry,
We have to win everything,
There will have some quarrelling,
Only memory will last.

Near and dear ones are not ours,
Everybody will forget us,
Nobody will be your companion—
Only memory will last.

Both land and gold will be yours,
You will not remain in the earth;
You will be the history—
You will be the Picture in this Planet.

Violence, Greed and angre will end,
Every near and dear will forget,
You will go back leaving this earth—
Only memory will last.

আহত সুর

সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত
উদ্ভিদবিদ্যা (সাম্মানিক) প্রথম বর্ষ

মীনার আশ্চর্য সুরের যাদুতে সারা ঘর স্তব্ধ। ঘরে পিন পড়লে বুঝিবা তারও শব্দ হবে। অরুময়বাবু তাঁর ছাত্রীর পিয়ানো বাজানো শুনে মুগ্ধ, বিস্মিত। এ কী কোন এগারো বছরের মেয়ের বাজনা, না কী কোন স্রোতস্বিনী ঝর্ণার উদ্দাম জলপ্রবাহের আনন্দমুখর কলতান। বাজানো শেষ করে মীনা অরুময়বাবুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। অরুময়বাবুর যেন সেদিকে খেয়ালই নেই। তাঁর মুখ দিয়ে শুধু একটি শব্দই বেরোল "অপূর্ব"।

মীনার বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন থেকেই মীনা পিয়ানো শেখে। মূলতঃ, তার মা সরলাদেবীর ইচ্ছাতেই মীনা পিয়ানো শিখতে আরম্ভ করে। যৌবনে পিয়ানো শেখার অপূর্ণ স্বাদ তিনি তাঁর মেয়ের মধ্য দিয়ে পূরণ করিয়ে নিতে চান। প্রথমদিকে মীনার বাবা মেয়ের পড়াশুনার ক্ষতি হবে ভেবে আপত্তি করলেও মা ও মেয়ের জেদের কাছে তিনি শেষ পর্যন্ত পরাভূত হন। মীনার বাবারই অফিসের এক কলিগ অরুময় মুখার্জীর খোঁজ দেন। সেই থেকেই অরুময়বাবু মীনাকে পিয়ানো শেখাতে আরম্ভ করেন।

যাই হোক, আমরা যেদিনের কথা দিয়ে গল্প শুরু করেছিলাম, সেই দিনেই আবার ফিরে যাচ্ছি। মীনা জিজ্ঞাসা করল, মাস্টারমশাই, বাজনা কেমন লাগল? এটা এবার স্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশনে বাজানো যাবে ত? —যাবে না আবার, আলবাৎ যাবে। এই বাজনা বাজানো না গেলে কোন্ বাজনা বাজানো যাবে শুনি? অরুময়বাবুর গলায় খুশীর সুর, আরে, তোমার এই বাজনা শুনে হলসুদ্ধ সবাই একেবারে অবাক হয়ে যাবে। তা, মীনা, তোমার ঐ সুরটা.....।

—"মাস্টারমশাই,"

— "কে"? অরুময়বাবুর কথায় বাধা পড়ল। দরজা ঠেলে মীনার মা ঢুকলেন। হাতে খাবারের ট্রে। তাতে, চা, চানাচুর, সন্দেশ ইত্যাদি রয়েছে। —এটুকু একটু খেয়ে নিন। তা আপনার ছাত্রীকে কেমন বুঝছেন? ওর হবে-টবে তো? মীনার মার গলায় খুশীর সুর।

— হবে না আবার, এই বয়সে এত সুন্দর বাজাতে কজন পারে? যদিও ওর সামনে প্রশংসা করা উচিত নয়, তবুও বলছি মীনা সত্যিই দারুণ বাজায়। দেখবেন, এককালে ও খুব নাম করবে।

স্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশন এসে গেল। মীনার মা, বাবা, এমন কী অরুময়বাবু পর্যন্ত উপস্থিত। মীনার বাজনা একেবারে শেষে। কবিতা, নাচ, ম্যাজিক, গান— সব হয়ে যাবার পর, মীনা শুরু করল তার পিয়ানো বাজনা। সারা হল যেন এক যাদুর ছোঁয়ায় ভরে গেল। সমস্ত আকাশে-বাতাসে যেন মনে হল এক দেবললনা তার বীণানন্দিত কণ্ঠে অপূর্ব সুধামাধুরী বর্ষণ করতে করতে চলেছে। যখন মীনার বাজনা শেষ হল, তখন সবার মনে হতে লাগল, এ বাজনা শেষ না হলে, কী ভালই না হত।

এদিকে, মীনার মার কিছুদিন যাবৎ হল বুকের কাছটা খুব ব্যথা ব্যথা করে। অনেকসময় ব্যথাটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। মীনার বাবা তাঁর সাধ্যমতো চিকিৎসা করিয়েও কোন ফল পাচ্ছেন না। ডাক্তাররাও ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। যেদিন মীনার স্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশন ছিল, সেদিন বুকের ব্যথাটা একরকম গোপন করেই তার মা স্কুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু, মীনার বাজনা শেষ হবার সাথে সাথেই মীনার মার বুকের ব্যথাটা অসহ্য হয়ে উঠল। কোনরকমে বাড়ী ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। বুঝে মীনার বাবা ডাক্তারকে ফোন করার পর শোওয়ার ঘরে এসে দেখেন সরলাদেবীর শরীরে প্রাণের সাড়া নেই। ডাক্তার এসে বললেন "হার্ট-অ্যাটাক"।

মীনার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা আর নেই। মীনা আর ভাবতে পারছে না। চুপচাপ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় সে। কিন্তু, মীনার চোখে জল নেই কেন? চোখদুটো শুকনো কেন? কাঁদো মীনা, কাঁদো, তুমি যে মাতৃহারা হলে, তা কী বুঝতে

পারছ না? মীনা তার পিয়ানো বাজানো একেবারে বন্ধ করে দিল। অরুময়বাবুর অনুরোধে যাও বা দু-একদিন বসল, কিন্তু বাজাতে পারল না। সেই মনমাতাল সুর মীনার হাতে আর উঠছে না।

মীনার বাবা অনিমেষবাবুর কাছে দিন দিন সংসারটা যেন শুষ্ক মরুভূমির মতো হয়ে উঠল। চারিদিকে কেবল সরলাদেবীর স্মৃতি। মীনাও যেন আজকাল কেমন হয়ে গেছে। চুপচাপ বসে থাকে। ডাকলেও সাড়া দেয় না। কিছু বললে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অনিমেষবাবু দিন দিন বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। কেবল কাজ আর কাজ। এইরকম কারও ভাল লাগে? এইভাবে চলতে চলতে, অনিমেষবাবুরই এক কলিগ তাঁকে হঠাৎ একদিন দ্বিতীয়বার বিয়ে করার পরামর্শ দেন। পাত্রী তাঁর এক দূরসম্পর্কের বোন। প্রথমে রাজী না হলেও সংসারের কথা, বিশেষ করে মেয়ের কথা ভেবে পরে রাজী হয়ে যান। শেষমেষ সেই কলিগের দূরসম্পর্কের বোনের সাথেই বিয়ে হয়। মীনার নতুন মা মুখে মীনাকে কিছু না বললেও মনে মনে তাকে যে খুব পছন্দ করত, তাও নয়। তবে, অনিমেষবাবুর ভয়ে খুব বেশী কিছু বলার সাহস পেত না।

এইভাবে, চলতে চলতে তিন বছর কেটে গেল। মীনার এখন চোদ্দ বছর বয়স। ইতিমধ্যে মীনার একটি ভাই হয়েছে। মীনা তাকে খুব ভালবাসে। কিন্তু, নতুন মা সবসময় তাকে মীনার কাছে থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। মীনার ভাইয়ের নাম সুগত। সুগতের যখন ছয় বছর বয়স, তখন একরকম হিংসাতেই তার মা তাকে জোর করে পিয়ানো শেখাতে আরম্ভ করে। অনিমেষবাবুর অরুময়বাবুকে রাখার ইচ্ছে থাকলেও তাঁর স্ত্রীর অনিচ্ছার সামনে তিনি হার মানতে বাধ্য হন।

নতুন মাস্টার মীনার ভাইকে পিয়ানো শেখাতে আরম্ভ করে। যে দুঘন্টা মাস্টারমশাই থাকতেন, মীনা চুপচাপ সেই দুঘন্টা নিজের ঘরে বসে পিয়ানো বাজানো শুনত। কিন্তু, কখনো ভুলেও ঐ ঘরের দিকে পা বাড়াতো না। একদিন হঠাৎ সুগত দিদির ঘরে একটা খাতা দেখতে পেয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখতে, দেখতে হঠাৎ দেখল, আরে, যেই গৎটা তাকে মাস্টারমশাই নতুন দিয়ে গেছে, সেটা দিদির খাতায় কী সুন্দর করে লেখা আছে। সুগত মীনাকে ধরে বসল, এই গৎটা সে কিছুতেই তুলতে পারছে না, এটা মীনাকে তুলে দিতেই হবে।

মীনা অনেক আপত্তি করল, অনেক বোঝালো, কিন্তু, ভাইয়ের জেদের সামনে তা খড়কুটোর মতো উড়ে গেল। মীনা বাধ্য হয়ে ধীরে ধীরে পিয়ানোর ঘরটায় ঢুকল। পিয়ানোটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল। এইখানে, এককালে বসে কত গান সে বাজাত। পিয়ানোর হলুদ রীডওলোয় সে তার আঙুল ছোঁয়ালো। তার মন অজানা এক আশঙ্কায় . . . । একী, এ কী বাজাচ্ছে সে! এ তো সেই বাজনা, যা শুনে হলসুদ্ধ শ্রোতা পাগল হয়ে যেত। মীনা নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। এ কী, সে বাজাচ্ছে! মীনা দেওয়ালে টাঙানো মার ছবিটার দিকে তাকালো। তার মনে হল, মা যেন হাসছে। এই প্রথম মীনার চোখে জল এল। মীনা কাঁদছে। তার দুচোখ বেয়ে অঝোরে নেমে আসছে শ্রাবণধারা। সেই নিঃশব্দ কান্না আর সুশব্দ সঙ্গীতে সারা ঘর যেন আজ ভরে উঠেছে।

"এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে,
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।"

—রবীন্দ্রনাথ

অভিনেতা

শুভদীপ মজুমদার
ইতিহাস (সাম্মানিক) দ্বিতীয় বর্ষ

"অটোগ্রাফ প্লিজ, অটোগ্রাফ প্লিজ—"

চারিদিক থেকে মানুষের আর্তি ভেসে আসছে। এবং সেই আর্তির মধ্যমণি এক সুপুরুষ, সুদর্শন যুবক। ঢেউ খেলানো চুল, লম্বা হ্যান্ডসাম চেহারা, নিখুঁত পোশাক ও স্মার্টনেস দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না তার পরিচয়।

রূপক কুমার!

মুম্বাইয়ের তারকাখচিত ফিল্ম ইন্ডাসট্রিতে যিনি এখন এক নম্বরে। এবং সুদূর ভবিষ্যতেও তার এই পয়লা আসন কেড়ে নেওয়ার লোক দেখা যাচ্ছে না। তাই তিনি নিশ্চিন্ত। সুখে যত না চেহারার জেল্লা, তার চেয়ে বেশি দেখা যায় সাফল্যের ছাপ। সাফল্য অনেক মানুষই পায়। কিন্তু রূপককুমারের মুখের পরিতৃপ্তি বুঝিয়ে দেয় যে তিনি সাফল্যের সেই স্থানে পৌঁছে গেছেন যার হয়ত কোনো সংজ্ঞা তাঁর জানা ছিল না।

অতএব এত ভীড়েও তিনি বিরক্ত হলেন না। বরং তাকে ঘিরে এই আকুতিটা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করলেন। ধীরে সুস্থে সই-শিকারীদের প্রার্থনা মেটালেন, ভিড়ের মধ্যে সুশ্রী কোন মুখ দেখতে পেলে কথাও বললেন। কিন্তু ভক্তদের এতকাছে এসেও তিনি বসে গেলেন অনেক দূরে। তার সমস্ত আচরণ, ব্যবহারে সেই গুরুত্ব ফুটে উঠছিল। রূপককুমার আপনমনেই একবার হাসলেন। তিনি যা চান তাই হচ্ছে। বাইরের লোক তাকে অমায়িক, ভদ্র বলেই জানছে। অথচ তিনি থাকছেন একই জায়গায়। সূর্যের আলো যেমন মানুষের এত কাছে, তবু কতদূরে! কথাটা ভেবে রূপককুমারের মুখে একটা হাসির ঢেউ খেলে গেল। হ্যাঁ, তিনি ওই সূর্যের মতনই থাকতে চান!

'এর পরে কি ফিল্ম করছেন?'

কোলাহল, প্রশ্নরূপে তার কানে এল। কিন্তু তিনি মুখ খুললেন না। এসব ছোটোখাটো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তাঁর সেক্রেটারী, সাঙ্গপাঙ্গরাই আছে। বৃথা বাক্যব্যয় রূপককুমার করেন না। এর মধ্যে গলায় দুটো মালা জমে গেছে। কে জড়ালো তিনি জানেন না। জানার দরকারও নেই। যা দরকার তা তিনি তখনই করছেন। সেক্রেটারী মুকুলকে চোখের ইশারায় গলা থেকে মালাগুলো খুলে নিতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে কাজ হল। গলার ভার কমিয়ে যখন তিনি আবার সামনে ফিরলেন তখন দেখলেন তার দিকে একটা নোংরা, দুমড়োনো কাগজ এগিয়ে ধরা। সেটা ধরে আছে একটি বাচ্ছা ছেলে। দেখেই বোঝা যায় সে বস্তির। খালি গা, ময়লা প্যান্ট। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে তার হাতে ধরা কাগজটা রাস্তা থেকে কুড়োনো। ছেলেটির চোখ দেখেই রূপককুমার বুঝতে পারলেন সে কি চায়। অন্যদের মতোই তার একটি অটোগ্রাফ। কিন্তু এরকম এক নোংরা ছেলে তার সামনে আসতে সাহস পায় কি করে? আশাই বা করে কি করে যে তিনি ওই কাগজের উপর সই করবেন?

তাঁর মেজাজ খিঁচড়ে গেল। তাঁর মুখে বিরক্তির ছাপ পড়ল। সেক্রেটারী মুকুলের সেটা চোখ এড়াল না। সে সামনে দাঁড়ানো ছেলেটার গালে ঠাস্ করে এক চড় কষিয়ে বলল 'ভাগ ইঁয়াসে!'

ছেলেটা চমকে দুরে সরে গেল। কিন্তু কেন মার খেল বুঝল না। শুধু হাতের কাগজটা পরম যত্নে মুড়ে তার প্যান্টের পকেটে পুরল। প্যান্টের পকেট যে ছেঁড়া তা তার খেয়াল ছিল না। তাই কাগজটা কিছুক্ষণের মধ্যেই মাটিতে পড়ে গেল। রূপককুমার গাড়ির দিকে এগোলেন। তার মেজাজ একবার বিগড়োলে চট্ করে ঠান্ডা হয় না। মুখে রুমাল দিয়ে শুধু বললেন 'ন্যাস্টি!'

ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে দিল। রূপককুমার উঠতে যাচ্ছিলেন, তার আগে তিনি শুনতে পেলেন পিছনে থেকে আসা জয়ধ্বনি 'রূপককুমার জিন্দাবাদ! রূপককুমার জিন্দাবাদ!'

তিনি একটু ঠান্ডা হলেন।

গাড়িতে ওঠবার আগে তিনি দর্শকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। হাসলেন।

তিনি জানেন তার এই হাসি দর্শকদের শান্ত করতে যথেষ্ট!

।। ২ ।।

পুরী! সেই পুরী! সমুদ্রের নোনা বাতাস জানলা দিয়ে এসে মুখে ঝাপটা মারতে কথাটা মনে এল রূপককুমারের। এবং তার ফলে চোখের তীক্ষ্ণ চাহনি অতীতের ছায়া পড়ায় একটু ঘোলাটে হল।

রূপককুমার গাড়ির ভিতর বসে থাকলেও তার মন ফিরে গিয়েছিল চারবছর আগের কিছু দিনে। যখন বন্ধুদের সাথে সেও এসেছিল পুরী বেড়াতে। না একটু ভুল বললাম। সে এসেছিল ঠিকই তবে তার পরিচয় তখন রূপককুমার ছিল না, ছিল তার আসল নামেই। পুলকেশ লাহিড়ী। সেই পুলকেশ যে আজ কোথায় হারিয়ে গেছে! তার মনের কোথাও কোনো কোণে হয়ত তার ছবি লুকিয়ে ছিল। যা আজ এই পুরোনো, চেনা বাতাবরণে এসে তাকে ঠেলে দিল পুরোনো স্মৃতির দিনগুলিতে।

অর্জুন, সোমনাথ, অর্ক, অভীক ও পুলকেশ— এই পাঁচজনের যে গ্রুপটা সেবার পুরী এসেছিল— তাতে পুলকেশ একটু আলাদা ধরনের ছিল। তার চোখে তখন থেকেই ছিল অভিনেতা হবার শখ। না, এই শখ শুধু শখই ছিল না। এই শখকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য সে রীতিমত খেটেছে। ছ ফুট এক ইঞ্চি র দীর্ঘ টানটান চেহারাটা আয়ত্তে আনতে তাকে অনেক কিছু বিসর্জন দিতে হয়েছে। কিন্তু সুন্দর চেহারা, অভিনয় করার জন্মগত দক্ষতা সত্বেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছিল না। কোনো পরিচালকের চোখে সে পড়ছিল না। তার সেই অপূর্ণ ইচ্ছে যে এই পুরীতে এসে পূর্ণ হবে তা সে কখনোই ভাবেনি।

দিনটা ছিল ৮ই এপ্রিল। দিনটা ভোলেন নি রূপককুমার। ভোলা সম্ভবও না।

বিকেলবেলা বীচে একা একাই ঘুরছিল সে তার বাকি চার বন্ধুই তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। পুলকেশ জানে তার বন্ধুদের বিকেল হয় সন্ধ্যে ছটায়।

বীচে ঘুরতে ঘুরতে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে ঠায় তাকাচ্ছিল সে। এরকম ভাবে যখন একসময় দাঁড়িয়ে তখন একজন স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক, মাথায় সান-হ্যাট এবং চোখে সোনার চশমা, সামনে এসে দাঁড়ালেন। এবং তারপর তাঁর প্রথম প্রশ্নই ছিল 'আর ইউ ইন্টারেস্টেড ইন অ্যাকটিং?'

রূপককুমারের এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে সে চমকে উঠেছিল। তার মনে হয়েছিল, সে স্বপ্ন দেখছে। তবু সে মনের চনকানি সামলে বলে উঠেছিল 'ইয়েস, আই অ্যাম!' 'দেন কাম উইথ্ মী! নানাভাই ওয়ান্টস্ টু টক উইথ্ ইউ!'

নানাভাই মুম্বাইয়ের মস্ত পরিচালক। তিনি তার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন শুনে রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। তবু সে গিয়েছিল এবং তার অ্যাকটিং দেখে নানাভাইয়ের মুখে হাসি ফুটেছিল।

রোলটা ছিল 'দিলদার' ছবির নায়কের বন্ধুর। রোলটা যার করার কথা ছিল সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় নানাভাই বাধ্য হয়ে অন্য লোক ধরেন। সেই চশমা-সানহ্যাট পরা লোকটা ছিল নানাভাইয়ের সেক্রেটারী। তাদের পছন্দ যে ভুল লোকের উপর হয়নি তা বুঝিয়েছিল পুলকেশ। স্বল্প অভিনয়, কিন্তু তাতেই বাজিমাত করেছিল সে। এই বাজিমাত আরও সম্ভব হয়েছিল তার হিন্দী বলার স্বাভাবিক স্বচ্ছতায়। তার মুম্বাইয়েই জন্ম এবং তাই রাষ্ট্রভাষা সে ভালই জানে।

এভাবেই পুরীর বালুতটে, এক সন্ধ্যের প্রাক-লগ্নে পুলকেশের ভাগ্য রেখা অন্য দিকে আঁকা হয়ে গেছিল। এবং এর কিছুদিন পরেই তার পুলকেশ নাম হারিয়ে গিয়ে জন্ম দিয়েছিল রূপককুমার।

রূপককুমার এর পরে আর কোনোদিন ফিরে তাকাননি। প্রতি মানুষের মধ্যেই দুটি ভিন্ন সত্ত্বা থাকে। একটি নিজস্ব তো অন্যটি প্রতিবাদী। সেই প্রতিবাদী সত্ত্বা হঠাৎ এখন ধড়ফড় করে উঠল। নিষ্ঠুরভাবে রূপককুমারকে মনে করিয়ে দিল আজ সে কত একা। তার শত্রু অনেক, কিন্তু বন্ধু? খ্যাক্‌খ্যাক্ করে অট্টহাস্য করল সেই প্রতিবাদী সত্ত্বা। কারণ তারকা নিশ্চুপ, তার কাছে কোনো উত্তর নেই।

শুধু তার নিজস্ব সত্ত্বা তাকে মনে করিয়ে দিল, এক নম্বর স্থানটি বারবারই বড় একাকী। যারা এই একাকিত্ব সহ্য করতে পারে তারাই থাকে পয়লা নম্বরে। স্থানটি বড় দুর্লভ বলেই তার জন্য এত প্রতিযোগিতা। যেরকম ভালবাসা বড় দুর্লভ বলেই তার জন্য এত দাবীদার! রূপককুমার আপনমনেই বলে উঠলেন 'আই ডোন্ট কেয়ার! আই ডোন্ট কেয়ার!'

নিজের ভাবনায় এতই জড়িয়ে পড়েছিলেন যে কখন স্টেশন ফেরত গাড়ি হোটেলের গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করেননি। খেয়াল হল মুকুলের ডাকে। 'স্যার', 'স্যার'?

রূপককুমার নামলেন। এবং নামতেই দেখতে পেলেন পরিচালক সুরিন্দর সিংকে। তিনি হাতে মোবাইল নিয়ে এগিয়ে এসে তার পিঠে চাপড় মারলেন।

'আজ পুরা দিন তুম রেস্ট লো রূপক। কাল সুভ্‌হ্‌ সে শুটিং হোগা।'

একটু নিশ্চিন্ত হলেন রূপককুমার। বিশ্রাম এখন সত্যি তাঁর প্রয়োজন। তিনি দেখলেন হোটেলের লবিতে ভর্তি লোক। সবাই তাকে ছুঁতে চাইছে, চাইছে কথা বলতে। কিন্তু পুলিশের গণ্ডি পেরিয়ে তারা আসতে পারছে না। তিনি আবার মুখে আনলেন সেই বিখ্যাত হাসি। তারপর সেক্রেটারি মুকুলকে চোখের ইশারায় বীয়ারের অর্ডার দিয়ে, লিফ্‌টের দিকে হাঁটতে লাগলেন তারকা রূপককুমার।

ধাক্কাটা দেবার পরমুহূর্তে রূপককুমার খেয়াল করলেন তিনি কি করলেন।

তিনি সকালের প্রথম শটের জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন বীচে। বীচের এইখানে সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে। পায়ের পাতায় ছড়িয়ে পড়ে সমুদ্রের ফেনা। রূপককুমার দাঁড়িয়ে ছিলেন সমুদ্রের দিকে পিছন ফিরে। পরিচালক সুরিন্দরের মতে সমুদ্রকে ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে শট্‌টুললে দারুণ ফোটোজনিক হয়।

আর একটা কারণ অবশ্য রোদ।

আজ সকাল থেকেই মেঘ আর রোদ একে অপরের সাথে লুকোচুরি খেলছে। এবং এর ফলে রোদের তেজটা একেবারেই নেই। রোদ ভাল ছবি তোলার পক্ষে একটি প্রধান বিষয়। তা হালকা হওয়ায় পরিচালক পড়েছেন মুস্কিলে। তবে এখনও সমুদ্রের উপর রোদ লেগে আছে। এবং তা ছড়িয়ে আছে ঢেউ আছড়ে পড়ার জায়গা অবধি। তাই সুরিন্দর নায়ককে ওখানেই দাঁড়াতে বলেন।

রূপককুমার দাঁড়ালেন। অন্য চরিত্ররাও প্রস্তুত। পরিচালক ক্যামেরায় চোখ রাখলেন। সাউন্ড-রেকর্ডিং যন্ত্র চালু হল। কিন্তু ফিল্ম যখন চালু করতে যাচ্ছেন তখনই হঠাৎ ঘটনাটা ঘটল।

একটি বাচ্চা মেয়ে হঠাৎ হাজির হল নায়কের সামনে। হাতে অটোগ্রাফ বুক নিয়ে।

রূপককুমার অভিনয়ের সময় অন্য কিছুতে মনোযোগ দেন না। এবং এখন যখন অভিনয়ের জন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত করছেন তখন এই মেয়েটির আগমন তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না।

অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবেই তিনি বাচ্চা মেয়েটিকে দিলেন এক প্রচন্ড ধাক্কা। মেয়েটি টাল সামলাতে পারল না। তার হাতের অটোগ্রাফ বুক ছিটকে গেল। সে নিজে আছড়ে পড়ল সমুদ্রের জলে। এবং ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বড় ঢেউ এসে আছাড় মারল তীরে। ঢেউটা সত্যি বড় এবং তার আছড়ানিতে রূপককুমারও টলমলিয়ে উঠলেন।

ঢেউ আছড়ে পড়ার পর হঠাৎ একটা জিনিস দেখে বীচের প্রতিটি লোক চমকে উঠল।

সেই বাচ্চা মেয়েটি নেই। কোথাও, কোনোখানে নেই।

কেবল বহু দূর থেকে কে যেন 'মা-আ-আ-আ' বলে চেঁচাচ্ছে।

হঠাৎ কে যেন তীর থেকে আছড়ে পড়ল সমুদ্রে। দু একজন স্থানীয় লোকের কথায় জানা গেল, এক নুলিয়ার ছেলে। সে অনেকক্ষণ ধরে নাকি তীরেই দাঁড়িয়ে ছিল। মেয়েটিকে পড়তে দেখেই সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

হ্যাঁ ওই যে মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে। তার ছোটমাথার বিনুনী ভাসছে, জলের তরঙ্গে। দুরে ক্রমে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে সে। আর সেই বাচ্চা ছেলেটি তীব্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে তাকে বাঁচাতে।

বীচের চারপাশের দৃশ্য অদ্ভুত! ফিল্ম-ইন্ডাসট্রির কারওর খেয়াল নেই যে রোদ মিলিয়ে যাচ্ছে। আকাশে মেঘরাশি পাড়ি দিচ্ছে অনেক বেশি। কিন্তু তবু পরিচালকের টনক নড়ল না।

রূপককুমার তার হুঁশ ফেরাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সক্ষম হলেন না।

সবাই প্রাণভরে, চোখভরে জীবনের দৃশ্য দেখছে! রোজই তো তারা কৃত্রিম দৃশ্য দেখে কিন্তু এরকম খাঁটি অ্যাকশন ফিল্ম ক-দিন দেখে?

এবার একটি নারীর কণ্ঠস্বর বীচের এই থমকে যাওয়া কোলাহলে এসে মিশল। হলদে শিফন শাড়ি পরা ভদ্রমহিলার চোখে, মুখে উদ্বেগ। গলায় আশঙ্কা। তিনি বীচের পথ ধরে এগোতে এগোতে ডাকছেন 'মিঠু, মিঠু'!

ভদ্রমহিলার মুখের সঙ্গে একজনের মুখশ্রীর খুব মিল লক্ষ্য করা যায়। সেই বাচ্চা মেয়েটির যে এখন পুরীর সমুদ্রে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। আন্দাজে মনে হয় 'মিঠু' ওই মেয়েটির নাম এবং এই ভদ্রমহিলা, তার মা।

হঠাৎ বীচে আবার কোলাহল ফিরল। কারণ সেই নুলিয়ার ছেলেটিকে দেখা যাচ্ছে। সে টলতে টলতে তীরের দিকে এগোচ্ছে। সে প্রাণপনে তার ওই ছোট বুকে আঁকড়ে ধরে নিয়ে আসছে বাচ্চা মেয়েটিকে।

তীরের কাছাকাছি আসতেই থমকে যাওয়া ভদ্রমহিলা, ওমোট আবহাওয়ায় দমকা বাতাসের মতো নিজের মেয়েকে চিনতে পারলেন। 'মিঠু' বলে এক পরিত্রাহি চিৎকারে ভদ্রমহিলা ছুটে গিয়ে ছেলেটির হাত থেকে টেনে বুকে নিলেন। সবাই ছুটল সেই ভদ্রমহিলা এবং মেয়েটির দিকে। সেই নুলিয়ার বাচ্চাটির দিকে কারও খেয়াল রইল না।

ছেলেটি ধীরে ধীরে, ধুঁকতে ধুঁকতে কোনো রকমে তীরে এসে আছড়ে পড়ল। নায়ক রূপককুমার যেখানে দাঁড়িয়ে তার চেয়ে মাত্র কিছু গজ দূরে।

রূপককুমার ছেলেটির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। ছেলেটিকে তিনি চেনেন। এই ছেলেটিই গতকাল তার কাছে সেই নোংরা কাগজে সইনিতে এসেছিল। সেই 'ন্যাস্টি' ছেলেটি। হঠাৎ রূপককুমারের বুকটা একটু কেঁপে উঠল। তা কেঁপেছে একটা জিনিস দেখে। ছেলেটির বুক ওঠানামা করছে না। ছেলেটির নিশ্বাস পড়ছে না।

তার মনে এক অজানা আশঙ্কা জেগে উঠল। এবং সেটা যে সত্যি তা প্রমাণিত হল একটি চা-ওয়ালার কথায়। 'একী! ছেলেটা মারা গেছে'!

' হোয়াট?' বলে প্রথমে এগিয়ে গেলেন পরিচালক সুরিন্দর সিং।

ক্রমে সবাই এল, এলেন সেই ভদ্রমহিলাও যার মেয়েকে বাঁচানোর জন্য ছেলেটি নিজের প্রাণ দিল। তারা কেউ মুখে প্রশ্নটা না করলেও, তাদের সবার মুখেই আঁকা ছিল প্রশ্নটা 'কি করে?' সেই চা-ওয়ালাটি ছেলেটির মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল 'ছেলেটাকে চিনতাম জানেন দাদা। ওর জন্ম থেকেই ক্যানসার। কিছুদিনের মধ্যে এমনিতেই মারা যেত। আজ এতখানি শক্তির অপচয় বোধহয় ওর শরীর নিতে পারল না। শরীরে ছিলই বা কি?'

সবাই চুপ। বীচে শুধু খেলা করছে বাতাস। সেই বাতাসের বেগ এখন বড় নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে।

ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সব লোক, ক্যামেরা ছেড়ে সাউন্ড-রেকর্ডিং যন্ত্র ফেলে এগিয়ে গিয়ে জড়ো হয়েছে ছেলেটির সামনে। তাদের সবার চোখেই জল। গ্লিসারিন নয়, অকৃত্রিম, খাঁটি চোখের জল।

সেই ভদ্রমহিলা মেয়েকে ফিরে পেয়েও কাঁদছেন। তার চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে কালো, নোংরা ছেলেটির মুখের উপর।

অদ্ভুত! তার মুখময় কোনো যন্ত্রণার ছাপ নেই। শুধু ছড়িয়ে আছে এক অশেষ তৃপ্তি। ছেলেটা জীবনে বেশি কিছু পায়নি। কিন্তু মরার আগে ছেলেটি আজ বোধহয় বুকভরা আনন্দ পেয়েছে। মেয়েটিকে বাঁচিয়ে। মৃত্যুর বিষ বুকে সে তুলে নিয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে কোথাও নিশ্চই অমৃতের সন্ধান পেয়েছে।

সেই অমৃতের স্বাদই বোধহয় লেগে আছে তার দুই চোখে, বন্ধ ঠোঁটে।

ছেলেটাকে ঘিরে জড়ো আছে সবাই। না ভুল বললাম।

সবাই নয়। একজন আসেননি।

নায়ক রূপককুমার।

একটি অপ্রিয় সত্য তিনি এখন বুঝতে না চাইলেও বুঝতে পারছেন।

পরিচালকদের ক্যামেরায় তিনি সেরা হলেও, জীবনের ক্যামেরায় তিনি সেরা নন। সেখানে আজ তিনি হেরে গেছেন। পরাজিত হয়েছেন এক নাম-না-জানা নুলিয়ার, নাম-না-জানা ছেলের কাছে।

"পৃথিবী-ইঁদুর-পরীক্ষা"

সৌম্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
রসায়ন (সাম্মানিক) দ্বিতীয় বর্ষ

কেমিস্ট্রি বিষয়টিতে আমি বরাবরই কাঁচা। সেই স্কুল জীবন থেকে এই বিষয়টিতে আমার যে দুর্বলতা তা কলেজ লাইফে আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। কবে যে তা ঘুচবে, বা আদপেও যাবে কিনা— কে জানে? যাই হোক সেবারও ছিল কেমিস্ট্রি পরীক্ষা। তখন আমি এই কলেজে ক্লাস ইলেভেনের ছাত্র। চলছে অ্যানুয়াল পরীক্ষা। কেমিস্ট্রির প্রশ্ন যে খুব একটা সুবিধের হয় না তার প্রমাণ পেয়েছি হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষায়। পর্বত-সমান সিলেবাস, সারা বছরের জমে থাকা পড়া মাথায় চেপে বসেছে, পড়েছি ঠিকই, কিন্তু বুঝেছি অল্প, তাই মুখস্থ-বিদ্যাই হয়ে উঠেছে শেষ অবলম্বন। এবং পরীক্ষার আগের রাতে তাও হারিয়েছি, গুলিয়ে যাচ্ছে সবই— অ্যাসিড্ বেস্ চিলেট কমপ্লেক্স্ সবাই যেন কেমন শত্রুতা করছে। তবে অরগ্যানিক্ কনভ্যার্শনের কিছু ছোট কাগজ যে বানিয়েছি— যাক সে কথা থাক!

পরীক্ষার আগের দিন খুব রাত পর্যন্ত পড়ার অভ্যাস আমার নেই। তাই ঘড়িতে সকাল সাড়ে-পাঁচটার অ্যালার্ম দিয়ে সেদিন রাত বারোটা নাগাদ আমি বিছানায় যাই, মে মাসের গরম, মাথার ওপর পাখাটা যেন আগুন বৃষ্টি করছে, মাথার মধ্যে কিল বিল অজস্র ফিনাইল-বিং, সাইক্লোহেক্সেন। পাশের অ্যাপার্টমেন্টে নাইট গার্ডের কন্‌ক্রীটের ওপর লাঠি ঠোকার আওয়াজ আরো বিরক্ত করছে। তবে এর মধ্যেও চোখের দুপাতা যে কখন এক হয়ে গিয়েছিল তা খেয়াল নেই।

অ্যালার্ম বেজে উঠল— ঘড়িতে ঠিক সাড়ে পাঁচটা। কিন্তু কি অদ্ভুত কাণ্ড। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না— বাইরে তখনও দিনের আলো ফোটেনি। অন্যান্য দিন যেখানে এই সময়ে জানলা দিয়ে আসা দিনের আলোয় ঘর ভরে যায় সেখানে ঘর আমার সেদিন ছিল অন্ধকার। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম স্ট্রীট্-লাইট্গুলো তখনও জ্বলছে। ভেবেছিলাম সাড়ে পাঁচটার বদলে বোধহয় সাড়ে চারটে অ্যালার্ম দিয়েছি, তাই বাইরে এত অন্ধকার। কিন্তু বারান্দায় গিয়ে বুঝলাম যে অ্যালার্ম দেবার কাজে কোন ভুল হয়নি। রাস্তায় লোকের ভিড় জমেছে। তাঁদের অনেকেই আরলি-রাইজার। শরীরচর্চার খাতিরে তাঁদের কেউ কেউ যান লেকে বেড়াতে, কেউ বা সামনের পার্কে কয়েকটা পাক মেরেই ক্ষান্ত হন। এবং বাকি যারা রয়েছেন তাঁরা মনে হয় লোকের সোরগোলে বাড়ীর বাইরে বেড়িয়ে এসেছেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি তাঁদের দিকে চেয়ে আছি। তাঁরা সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ঘড়িতে তখন পৌনে ছটা— মে মাস অথচ আকাশ অন্ধকার। তাই সকলের মধ্যেই জেগে উঠেছে এক স্বাভাবিক চাঞ্চল্য। ওইতো দাঁড়িয়ে আছে রবিন কাকা, জয়া পিসি, স্বপ্নাবৌদি ও আমাদের সবজান্তা ইলোরাদি। তারা একে অন্যকে কি যেন বোঝাতে চাইছে।

লোকের দেখাদেখি আমিও বাড়ীর বাইরে বেড়াবার জন্য তৈরী হলাম। এই অপার্থিব ঘটনা বাড়ীর আর সকলের ঘুমও ভাঙিয়েছে। চায়ের দেরী আছে শুনে ছোটকাও আমার সাথে বেরিয়ে এল। রাস্তা পেরিয়ে উল্টো দিকে ফুটে যেখানে অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীদের ভিড় সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। নৈসর্গিক এই বিপর্যয়ের কারণ শুনে আমি থ' হয়ে গেলাম। টি.ভি., রেডিও সবেতেই নাকি বলা হয়েছে যে আগের দিন রাতে, ভারতীয় সময় রাত ২.৪০ মি. নাগাদ পৃথিবীর আহ্নিক গতি হঠাৎ থমকে যাওয়ায় সেদিন আর সকাল হয়নি। জাপান, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা সর্বত্রই নাকি এই অজাগতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। পৃথিবীর কোথাও সকালের প্রতীক্ষা কোথাও বা সন্ধ্যার কোথাও আকাশের নির্দিষ্ট কোন স্থানে বসে পড়েছে দুপুরের চড়া রোদ, কোথাও বা আকাশের তারা স্তব্ধ হয়ে একদৃষ্টিতে দেখছে পৃথিবীর মানুষকে। আমাদের মধ্যেও চলেছে আলোচনা। কতজনই না কতরকম ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছেন এই দুর্ঘটনার। এক ভদ্রলোক এই ঘটনাকে আমেরিকার কোন নতুন রাজনৈতিক চাল বলে সকলকে মুখটিপে হাসতে দেখে আবার চুপকরে গেলেন। আক্ষেপের সুরও আছে অনেকের গলায়। কার জরুরী মিটিং কার বাইরে যাওয়া, কার বা ভাইপোর বিয়ে— সবই বোধহয় ভেস্তে গেল। আমাদের পরীক্ষাও বোধয় আর হবে না— তবে ঠিক ভরসা পাচ্ছিলাম না। কখন যে সাতটা বেজেছে খেয়াল করিনি। আকাশ অন্ধকার।

বাড়ীতে ফিরে এলাম। আমাদের ইউনিভ্যার্সাল অমিয়া দিদিমা ঠিক সময়েই হাজির হয়েছেন— মানে অন্যান্য দিন সকালের চা-জলখাবার তিনি আমাদের বাড়ীতেই সারেন, টেবিলের উল্টোদিকে বসেছিল কাম্মি। কাম্মিকে দিদিমা বলেন— "বুঝলে মা এই ছেলে-ছোকরাদের পাপেই পৃথিবীটা রসাতলে গেল।" কথাটা বোধয় আমাকে দেখেই, যাই হোক, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পাড়ায় রক্ষেকালী পুজোর বিধান দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন, পরীক্ষার চিন্তা বা ভয় আমার মাথা থেকে কখন যেন উবে গেছে। চায়ের পাট চুকিয়ে আমি বসলাম টিভির সামনে। ঘড়িতে বাজে আটটা, আকাশ আগের মতই অন্ধকার। বি.বি.সি. থেকে সি.এই.এন, টি.ভি.আই থেকে ডি. ডি. ইন্ডিয়া সর্বত্রই চলেছে একই পর্যালোচনা। হঠাৎ হাজির হল গোলাপ— আমার কলেজের সহপাঠী রসায়ন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য আমারই মতন। বাঁহাতে একটি তিন ব্যাটারীর টর্চ আর ডানহাতে একটা উইকেট। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল "পৃথিবী,-ইঁদুর-পরীক্ষা"। প্রথম শব্দটির ইঙ্গিত জলের মতো পরিষ্কার। পরীক্ষার কথা বুঝলাম না, আর ইঁদুরইবা কি, কে জানে? সোফায় বসে গোলাপ প্রায় পাঁচ মিনিট চুপ করে রইল। আমি টর্চ আর উইকেট সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায়, গোলাপ জানলার দিকে দেখিয়ে দিল। জানলায় গিয়ে দেখি অন্ধকার আরো গাঢ় হয়েছে কারণ রাস্তার আলো নিভে গেছে। এবং টর্চ বোধহয় সেই জন্যেই। আর উইকেট, সে বোধহয় রাস্তার কুকুরের হাত থেকে আত্মরক্ষার হাতিয়ার।

গোলাপ এতক্ষণে মুখ খুলল। বলল "পরীক্ষা হবে না, রাজ্য সরকার সমস্ত স্কুল-কলেজ, দপ্তর-বন্দর সর্বত্রই ছুটি ঘোষণা করেছে।" আমি বললাম, "আর ইঁদুর.." গোলাপ যা উত্তর দিল তা অবিশ্বাস্য। এই নৈসর্গিক বিপর্যয়ের সাথে এক উদ্ভট প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে যা দেখতে ইঁদুরের মত ঠিকই কিন্তু আয়তনে তার দ্বিগুণ, তারা দল বেঁধে আসছে এবং মিনিটের মধ্যে বই পত্র কাগজ খেয়ে চলে যাচ্ছে। আমাজনের পিরান্‌হার থেকেও বুভুক্ষু এই ইঁদুরের কথা শোনামাত্র ছুটে গেলাম ওপরে আমার ঘরে। দরজা খুলে দেখি প্রায় পঁচিশটি ইঁদুর (বা তার বৃহৎ সংস্করণ) টেবিলের ওপর রাখা বই খাতা সব চিবিয়ে খাচ্ছে। আমার পায়ের শব্দে তারা মুহুর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল। পড়ে রইল "বইপত্রের ধ্বংসাবশেষ"। কিরকম যেন হতবাক হয়ে আমি নীচে নেমে এলাম। গোলাপ তখনও সোফায়, উপস্থিত আরো দুজন— গুপ্তা ও বুম্বা, সকলেই আমরা চুপচাপ। টিভি বন্ধ করে বুম্বাই প্রথম মুখ খুলল— পরীক্ষাতো আর হচ্ছে না— কলেজের সামনে আবার ঘুরে এলে— "আমরা সবাই রাজি, অন্ধকারে ঠিকই তবে গোলাপের টর্চতো আছেই।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে জটলা— কথাবার্তার বিষয় দুটি, পৃথিবী আর ইঁদুর বা তা যাই হোক, হঠাৎ কোথা থেকে যে এই বিচিত্র প্রাণীর আবির্ভাব হল বা এত কোটি বছর পরে পৃথিবীই বা কেন ক্লান্ত হয়ে পড়ল তার কারণ কারোরই জানা নেই। আমরা চললাম কলেজের দিকে, রাস্তায় দেখা পিকু আর ডিন্টুর সাথে। পরীক্ষা হচ্ছে না, সকলেই যেন অনেক হাল্কা, কলেজের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, সরকার ছুটি ঘোষণা করেছে ঠিকই, চারিদিক অন্ধকার— তবে ছেলেদের উপস্থিতির কোন ঘাটতি নেই, সবাই যেন এক অদ্ভুত নেশায় মেতে উঠেছে। তাই কলেজে নেই রবিবারের ছবি— এতো চির পরিচিত উইক-ডের কলেজ— শুধু আকাশে আলো নেই এই যা। মামুর দোকানে ভিড়, ত্রিবেণীও অন্যদিনের মতোই ব্যস্ত। এইতো রয়েছে অশোকদাও, লজেন্সের জার হাতে কত কথাই না বলছে। কলেজ গেটে কর্তৃপক্ষ কি যেন একটা নোটিশ দিয়েছে। ভিড় ঠেলে তা পড়ে বুঝলাম যে এই ইঁদুর দেবতা খালি অনিষ্টই করছেন তা নয় কখনো তিনি আমাদের ওপর সদয়ও বটে। কোয়েশ্চেন সেলের মধ্যে সব প্রশ্নপত্র এক রাত্রে সব কুঁচিয়ে দেবার ফলে, আলোর ব্যবস্থা হলেও আগামী দশদিন আর পরীক্ষা হওয়া সম্ভব নয়। কলেজের রকে বসে আড্ডা মারছি, আকাশ তখনও অন্ধকার . . .

"পিক্ পিক্" শব্দে অ্যালার্ম বেজে উঠল। ঘড়িতে ঠিক সাড়ে পাঁচটি, ঘর আলোয় ভরে গেছে। জানলা দিয়ে সূর্যের আলো এসে বিছানায় পড়েছে, পাশ করার আশা যে স্বপ্ন আমার মনে জাগিয়েছিল, সূর্যোদয়ের সাথে তা ভেঙে গেছে। পরীক্ষা সেদিন হয়েছিল ঠিকই— কত পেয়েছিলাম তা না বলাই ভাল।

মুস্কিল আসান

সংঘমিত্রা চক্রবর্তী
বাংলা (সাম্মানিক) প্রথম বর্ষ

আমেরিকা নামক দেশে নাকি ড্রিল করে টাকে চুল গজাবার পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার ৭টা ২২ মিনিট ৩৩ সেকেন্ডে রেডিওতে এই বিচিত্র সংবাদ শুনে তেপ্পান্ন বছরের কেশরাম সিংহের উনচল্লিশ বছর বয়সী একমাত্র পরিবার শ্রীমতী স্নেহলতা সিংহ আজ তিনদিন ধরে খুব উত্তেজিত ও কর্মব্যস্ত।

কিছুদিন আগে ওর এক বান্ধবী বলছিল— যাই বলিস স্নেহ, তোর কর্তা কিন্তু খুব হিসেবী— আয়না কেনার খরচা তোর বেঁচে গেল।"

কি? এতবড় অপমান! কি নেই কেশোর? অমন সুপুরুষ! অত বড়লোক। বিদ্যের জাহাজ! কেবলমাত্র কিছু চুলের জন্য এত বড় হেনস্থা। একরাশ রেশমের মতো ঢেউ খেলানো চুল দেখেই না ও কেশোর প্রেমে পড়েছিল!

চোখ ফেটে জল আসে আর কি!

যে করেই হোক কেশোর টাকে চুল গজাতেই হবে। মুখের মতো জবাব হয় তাহলে।

এতদিন ধরে অনেক চেষ্টা চরিত্রির করেছেন তিনি। অর্থ ব্যয় করেছেন জলের মতো।

সদ্যজাত বাছুরের চোনার সঙ্গে পিয়াজ ও পাতিলেবুর রস মিশিয়ে দুপুরের ঘুম কামাই দিয়ে দিনের পর দিন মেখেছেন।

কিন্তু কি হলো তাতে? চুলের দেখা মিলল্যে কই?

অবশেষে এই বিচিত্র সংবাদ

বেঁচে থাক্ রেডিও

সাজ সাজ রব পড়ে গেল। অর্ডার হয়ে গেল নিয়ে এস সেই ডাক্তার যে ড্রিল করে টাকে চুল গজিয়ে দেবে। ভিজিটের জন্য, কুছ্ পরোয়া নেই।

কিন্তু হা হতোস্মি। মোটা টাকার লোভ দেখিয়েও দেশী বিদেশী কোনো F.R.C.S.-কেই রাজী করানো গেল না।

স্নেহলতা ভেবেই পায় না কি এমন কাজ! কতটুকুই বা কাজ! একটা তো মাত্র টাক।

কিন্তু দমবার পাত্র নন তিনি। হুকুম হলো খোঁজ চালিয়ে যাও।

অবশেষে ইউরেকা।

৫৩ নং বাদুড় বাগান লেনের ৭২ বছর বয়সী এক টেকো ডাক্তার রাজী হলো।

মিলিটারী ফেরতা ডাক্তার।

রিটায়ার করার পর ছেলের কাছে আমেরিকা বেড়াতে গিয়ে ড্রিল করে টাকে চুল গজাবার কায়দাকানুন হাতে কলমে রপ্ত করে এসেছেন। তবে তার ফরমায়েস মতো চুল চাই তবেই নচেৎ নয়।

"ব্যাস। কেল্লাফতে। এবার?

এবার বলার ভঙ্গি দেখে সিংহমশাই ঘোর আপত্তি করে বললেন।

"খোড়াখুড়ি করে হয়ত টাকে চুল গজালে কিন্তু সে জিনিস লোককে দেখাবার জন্য ধড়ে মাথাটা শেষ পর্যন্ত থাকবে তো।

স্নেহময়ী দেবী সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলেন। —"যা বোঝো না তা নিয়ে মিথ্যে টাক ঘামিয়ো না। ধড়ে মাথা তোমার থাক চাই না থাক টাকে চুল আমার চাই-ই-চাই।

এবার আবার খোঁজার পালা।

এত কাঠখড় পুড়িয়ে লোক যদি বা জোগাড় হলো বস্তুতঃ ডুমুরের ফুল।

চোখ ফেটে জল আসে স্নেহলতার।

অবশেষে আবার ইউরেকা।

শ্রীমতী সিংহের এক খুড়তুতো ভিক্ষে ভাই ন্যাড়া পরামর্শ দিল খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে। টাকায় বাঘের দুধ পর্যন্ত পাওয়া যায়। আর এ তো সামান্য জিনিস— চুল। বিজ্ঞাপনের বয়ানও সে ঠিক করে দিল।

"ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন"

"চুল কিনতে চাই। ১ সেমি ব্যাস, ১৯ সেমি লম্বা, একটু তামাটে আভাযুক্ত ঈষৎ কুঞ্চিত ১৩৬৭৫২ মাইক্রোগ্রাম ওজন বিশিষ্ট সর্বসাকুল্যে ১২২১৬৩৩২ টি চুল যে কোনো মুল্যে কিনতে চাই।

যোগাযোগের ঠিকানা

C/o ন্যাড়া অধিকারী

৪৯ নং বেলতাল রোড

হালতু-৪৪০৪২০

চুলের মালিকানা! বেশ কিছু টাকা রোজগারের এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করবেন কি? ভেবে দেখুন! মাথায় চুল আপনাদের তো প্রায় সকলেরই আছে— অনেক, অনেক চুল।

নগরজীবনের চালচিত্রে শারদোৎসব ঃ কিছু অনুভব

পল্লব মুখোপাধ্যায়
উদ্ভিদবিদ্যা (সাম্মানিক) দ্বিতীয় বর্ষ

বছর ঘুরতেই এ শরতে আবারো হাজির অতি পরিচিত শারদোৎসব, অনেককিছু সঙ্গে করে। হাজির শতাব্দীর শেষ লোকসভা নির্বাচন, অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়। গতবারের মতন এবারের শারদোৎসবেও মিশে আছে বাংলার বিপর্যস্ত মানুষের দুর্দশার চিত্র। তবু এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আশ্বিনের শিউলিঝরা সকালে ঘাসের আগায় বিন্দু বিন্দু শিশিরকণা শুকোবার আগেই পল্লীবাংলার পথে পথে পাওয়া 'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, উমা মা আমার কত কেঁদেছে'র সুর বাঙালির অন্তরকে রসার্দ্র করে তোলে। আর শহুরে মানুষ 'চাঁদার বিল হাতে ছেলের দলকে, দেখলেই পরিণত হয় রক্তচাপের রোগীতে। তবু বাঙালির মন-প্রাণ এই উৎসবের ব্যাপকতায় একাকার হয়ে গিয়েছে। আলোতে, হাসিতে, ঢাকের বাজনায়, মাইকের কানফাটানো সুরের তীব্রতায়, নতুন পোশাকে, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীর চপল হাস্যে-লাস্যে এ এক অনবদ্য অনুভবের সৃষ্টি করে।

আর তো একটা মাত্র দিন। স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ছুটি পড়ে গিয়েছে। আজ পঞ্চমী। শারদোৎসব মানেই শরতের নীলাকাশ, কাশ ফুলের উথাল পাথাল আর আনন্দের হাজার উপকরণ যা এই কৈশোরোত্তীর্ণ সাম্প্রতিকের মনের ঝাড়বাতিতে আলোর রোশনাই এনে দিয়েছে। কিন্তু একুশ শতকের দোরগোড়ায় পৌঁছে নগর কলকাতার শারদোৎসবের গোটা চালচিত্রটাই বদলে গিয়েছে। গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনে পুজো এখন এক একটা শ্রেণীর কাছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আসে।

'আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি, পূজার সময় এল কাছে।' সেই কোন্ শৈশবের অজানা দিনে শিশুকাব্যগ্রন্থ হাতে করে মুখস্ত করেছিলাম এই চিরপরিচিত পংক্তিটি, অথচ ফি বছর দৈনন্দিন ব্যস্ততার ফাঁকে শারদোৎসবের প্রাক্কালে ঘন নীল আকাশের পেঁজা মেঘ দেখেই নিজের অজান্তে উঁকি মারে এই স্মরণীয় পংক্তি। বড়দের মুখে শুনেছি তখনকার পুজোর উন্মাদনার কথা, কিন্তু এখন কি আর প্রকৃতই আশ্বিনের মাঝামাঝি বাজনা বেজে ওঠে, নাকি আগমনী গানে ভরে যায় দশদিক? কে আর শুনতে পায় 'এবার উমা এলে আর উমা পাঠাব না'। এখন শারদীয় সংখ্যার চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞাপন, পুজোর পোশাক হাব্দামা আর দীনদয়াল বাজোরিয়ার নিজে সর্বস্বান্ত হয়ে বাঙালির মুখে পুজোর হাসি ফোটাবার জন্য বিপণনের হাত ধরে শারদোৎসব আসে। আজকাল হালফ্যাশনের যুগে বোধ করি বাড়ির সবার সঙ্গে পুজোর বাজার করার দিনও শেষ হয়ে গিয়েছে। এখনকার তরুণ তরুণী, যুবক-যুবতীরা পুজোর মাসখানেক আগে থেকেই বাবা-মার কাছ থেকে বাজেট জেনে নিয়ে শার্ট, জিনস্, স্কার্ট, টপ, মিডি, সালোয়ারের দোকানে ছোটে। বাবার মুখে শুনেছি অষ্টমীর অঞ্জলি প্রদানের গল্প। পুরোহিতমশাই-এর ভারী, ভরাট গলায় উচ্চারিত হচ্ছে মন্ত্র, আর সবাই তা সমস্বরে উচ্চারণ করে দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করছে। এখন পুষ্পাঞ্জলির রেকর্ড করা মন্ত্র উচ্চারিত হয় ক্যাসেটের মাধ্যমে মাইক্রোফোনে। আর পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্রে লিপ দিতে দিতে মানুষ 'মাতৃরূপেণ সংস্থিতার কাছে প্রার্থনা জানায় মা আরও দাও। প্রমোশন দাও, বাড়ি-গাড়ি-ফোন, ওয়াশিং মেশিন দাও, জয়েন্ট এন্ট্রান্স, ভর্তি পরীক্ষার লটারিতে নাম ওঠাও। এখন পুরোহিত আসেন স্কুটারে চেপে সামারস্যুট পরে শুধু পুজোর সময় হালফ্যাশন— সনাতন সাত্ত্বিক কস্টিউমে বদলে যায়।

শারদোৎসবের আধুনিক ঘরানায় শহুরে পুঁজির ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে। জুতো, রঙের কোম্পানী, মাজন, মলম, লজেন্স, ঠান্ডা পানীয়র কারবারি সর্বাধিক বিক্রিত পত্রিকা কন্‌সোর্টোরিয়াম তৈরী করে শহুরে বাণিজ্যিক পুজো সংস্কৃতিকে মূলধন যোগায়। 'ত্রিনয়নী দুর্গা'র লোগো ঢাকের বাজনা সহযোগে মিনিটে মিনিটে দূরদর্শনের পর্দায় ভেসে ওঠে। গণমাধ্যমে একের পর এক চটকদার, ধাঁ চকচকে পুজোপ্রস্তুতি সংক্রান্ত মুখ্য সংবাদ পরিবেশিত, সম্প্রচারিত হতে থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াই শুরু হয় বিভিন্ন বারো কিংবা বারোর অকৃত্রিম গুণিতক ইয়ারি পুজো কমিটির মধ্যে। কার কত লক্ষটাকার বাজেট, কে

কোন প্রাসাদ, মন্দির, ইমারত, গীর্জার আদলে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত মণ্ডপ তৈরী করে সমুদয় খরচ বাঁচিয়ে বন্যাত্রাণ তহবিলে দান, বস্ত্র বিতরণ, প্রতিবন্ধীদের সাহায্য, বৃক্ষরোপণ করেছে জনপ্রিয় প্রেস থেকে নিষ্কাশিত উত্তপ্ত প্রভাতী ও সান্ধ্য দৈনিকের কল্যাণে তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। পুজোর বাজেট, মণ্ডপের আকৃতি, আলোকসজ্জা স্থির করে দেয় উদ্যোক্তা ও রাজনৈতিক মাস্‌লম্যানদের প্রভাব প্রতিপত্তি।

কলকাতা ও শহরতলির মৌসুমী পুজো বোনাস, এক্সগ্রসিয়া দাবিদাওয়ার আন্দোলন চলতে থাকে। কলকারখানা, অফিস, আদালত, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্টানে কর্মরত, বেতন ভোগী বাবু 'ত্রিনয়নী লোগো' সম্বল করে বাৎসরিক আন্দোলন শুরু করেন। অফিস-আদালত, কলে-কারখানায়, রাস্তায় রাস্তায় পুজো বোনাসের দাবিতে পোষ্টার গড়ে, দেওয়াল লিখন দেখা যায়। জলের ওপরে যখন এমন ফুট কাটতে থাকে, তখন কলকাতাসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বড় বড় জাল ঘাড়ে করে ব্যাপারীরা প্রস্তুত হয়। বেতারে, দূরদর্শনে, পত্র-পত্রিকায়, পোস্টার, ফেস্টুন, ব্যানারে 'ত্রিনয়নী লোগো'র চার ফেলে অপেক্ষা করে। তারপর একের পর এক বেড়াজাল মায়াজালের মাধ্যমে সমুদয় বোনাস এক্সগ্রাসিয়া তুলতে থাকে। নামী দামী কলমচিরা নানাবিধ নগরকেন্দ্রিক পত্র-পত্রিকায় পুজোর বাতাবরণ তৈরীর উদ্দেশ্যে কত গ্রাম বাংলার পুজো সংস্কৃতি, অতীত পুজোর অনুপুঙ্খ বর্ণনা সহযোগে বাঙালি নষ্টালজিয়ায় অবিরাম সুড়সুড়ি দিতে থাকেন। অমুক দাদা, তমুক দাদার ভায়েরা পাড়ায়-পাড়ায়, বাড়ি-বাড়ি, দোকানে-দোকানে চাঁদার বিল ধরিয়ে দিয়ে যায়। নামী দামী অফিসের বড়বাবু, অধ্যাপক, সরকারী চাকুরে, শিক্ষকবাবুরা দাঁত কিড়মিড় করতে করতে পারিবারিক সম্ভ্রম রক্ষা করতে চাঁদা ভরেন দরাজ হাতে।

নগর কলকাতার প্রাণ কেন্দ্রে বসে জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকায় পুজোর খাওয়া-দাওয়ার ফিরিস্তি পড়তে গিয়ে মনের কোণে ইতিউতি উঁকি মারছে ফেলে আসা অতীতের কত না টুকরো টুকরো স্মৃতি। কর্মব্যস্ততার যাঁতাকলে পিষ্ট হওয়ার ফাঁকে ও পুজোর সময় আমরা যেতাম মালদায়, আমাদের বাড়িতে। গ্রামবাংলার ফাঁকে ফাঁকে মফঃস্বলী হাওয়া এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগাত বছরের ঐ কটা দিন উত্তরবঙ্গের জেলাটিতে। গোঁড়া, রক্ষণশীল পরিবারের সদস্য হয়েও পুজোর ছুটির ফাঁকেই বছর বারোর চঞ্চল মতী কিশোরের মগজে চেপেছিল অগ্রজ, অনুজ ও আর পাঁচজন সঙ্গীসাথীদের নিয়ে মুরগীর ফিস্ট করার দুর্বুদ্ধি। রান্নাটি জবরদস্ত হলেও ঠাকুরমা গরম মশলার গন্ধ পেয়ে শুধোলে পর রামপাখি-টাখি জাতীয় একটা কিছু বলে পার পেয়েছিলাম। তারপর 'শুদ্ধ নিয়মমতে মুরগিরে পালিয়া / গঙ্গাজলের যোগে রাতে তার কালিয়া' কপালে জুটেছিল। বড়দের মুখে শুনেছি অনেক আগে পাখি তো দূরের কথা পাঁঠার মাংসের দোকান ছিল না, রাজবন্দি নেহাতই কম না হলেও রাজবন্দির পাঁঠার দোকান 'নৈব নৈব চ'। সেবার গদাইদের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজোর আগে গুরুদেব এসে বিধান দিলেন লক্ষ্মীপুজোয় পাঁঠাবলি অতি পুণ্য কর্ম। তবে লক্ষ্মী বিষ্ণুপত্নী, বৈষ্ণবীদেবী, কৃষ্ণবর্ণের ছাগে তাঁর অরুচি, অতঃপর শ্বেত অজার সন্ধান। অনেক খুঁজে শেষে সাদা-কালোয় আধাআধি মিশেল মিলল। গুরুদেব ১৬৪ খানি শাস্ত্র ঘেঁটে, সিকি ইঞ্চি টিকি নাড়িয়ে বললেন দোষ নেই তাতে। অগত্যা লক্ষ্মীপুজোর মধ্যরাতে ছাগমাংস সহযোগে সনাতন খিচুড়ি জমে উঠেছিল। পুজোর বাজারে প্রসাদ ছাড়া কি চলে? বাতাসা ছাড়া হরির লুঠ অসম্ভব, সিন্নি ছাড়া সত্যনারায়ণ 'নৈব নৈব চ'। মনসাকে পাথর বাটিতে দুধকলা অর্ঘ্য দিতেই হবে, কারণবারি বিনা চামুণ্ডা পুজো অচল, পীরের দরগায় খিচুড়ি চাই গাজির থানে ফিরনি। অন্নপূর্ণার ভোগ অন্নকূট, জগন্নাথের 'আনন্দে খাইয়া ভাত মাথায় মুছিব হাত' আর ধনকুবের তিরুপতির ৫ কেজি ওজনের পবিত্র, দশাশই লাড্ডু। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন ধর্মের গ্লানি হলেই আমি মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হব আর মহিষাসুর মর্দিনী বললেন 'গর্জ গর্জ তাবৎ মূঢ় যাবৎ মধু পিবম্যেহম।' বাঙালি সুযোগ সন্ধানী, দেবীর হাঁক ডাকের অন্তরালে উৎকৃষ্ট মাধ্বী সুরাপানের কথা শুনেই কেষ্ট ঠাকুরের তাত্ত্বিক জ্ঞানের কথা ভুলে সুরামত্ত দেবীকে জাতির দেবতা বানিয়ে ছাড়ল!

জাতির দেবতার আরাধনা গ্রামেও হয়, তবে একুশ শতকের দোর গোড়ায় পৌঁছে বদলে গেছে গ্রামের পুজো ও দাদুর মুখে শুনেছি আমাদের দেশের বাড়িতে যখন দুর্গোৎসব হত তখন রহিম চাচার কাঁধে চেপে তার চার বছরের বাচ্চা ছেলে করিম দুমাইল দূর থেকে দুর্গা ঠাকুর দেখতে আসত। দেখে হাততালি দিয়ে বলত— 'আহা! দুগ্গি দেখলাম চাচা! এক বেটি এক সিংহের'পরে লম্ফ দিয়ে যুদ্ধ করে, আহা! দুগ্গি দেখলাম চাচা।' বেহালার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়িতে শারদোৎসবের

সূচনা হয়েছিল কারো ইয়ারের কল্যাণে। কিন্তু এখন বারোর জায়গায় চব্বিশ, ছত্রিশ কিংবা আটচল্লিশ ইয়ার এসেছে।

কলকাতার বড় বড় পুজোগুলোতে স্পনসর করতে এগিয়ে আসছে কোন সিগারেট কোম্পানী বা কোন মদ প্রস্তুত কারক কোম্পানী। কে বলতে পারে হয়তোবা একটা সময় আসবে যখন পুজোর গায়ে একটা লেবেল সেঁটে তাতে লেখা থাকবে এটা অমুক সিগারেটের বা এটা তমুক জুতোর পুজো। সার্বজনীন পুজোর গা থেকে আন্তরিকতার প্রলেপটা উঠে গিয়েছে। কলকাতার শারদোৎসবে বেগ এসেছে, চলে গিয়েছে আবেগ। পুজো আজ বিশাল পণ্য। কুমোরটুলিতে প্রতিমায় পড়ছে শেষ তুলির টান, আকাশে নীল সাদা মেঘের ভেলা। আছে সবই কিন্তু কেমন যেন যান্ত্রিকভাবে। হৃদয়ের সেই আর্তির বড় অভাব। সেদিন মেট্রো রেলে যেতে যেতে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বলছিলেন পুজোর মাহাত্ম্য, আধ্যাত্মিকতার কথা। তাঁর মতে আজকের কজন ছেলেমেয়ে খবর রাখে যে দুর্গা বৎসরান্তে তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাবার বাড়িতে এলে মহাদেব ও লুকিয়ে লুকিয়ে চলে আসেন শ্বশুরবাড়িতে। চাঁদোয়ার নিচে কিংবা চালচিত্রের এক কোণে উঁকি দেয় নীলকণ্ঠের মুখ। আজকের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী এসব গল্প শুনতে আগ্রহী নয়। তাদের আগ্রহ পুজোর নতুন ফ্যাশন ডিজাইনের প্রতি। পুজোর মুম্বইয়ের নামী-দামী তারকা কি সানগ্লাস পড়ছেন কিংবা কোন শার্ট পড়ছেন অথবা কোন জিনস্ পড়ছেন অথবা শারদীয় ফ্যাশন পত্রিকার হেয়ারস্টাইলের উপর কি লেখা হয়েছে এসব দিকেই বেশী আগ্রহ তাদের। দোষটা কি সবটাই তাদের? না, আমরা গঠনমূলক, সাংস্কৃতিক, রুচি, ঐতিহ্য, পরম্পরাকে সুচারুভাবে তাদের সামনে তুলে ধরতে ব্যর্থ হচ্ছি— এটা ভাবার সময় এসেছে। গতবছর শারদসম্মানে একটি বিশেষ সংগঠনের তরফে বিচারক হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেইসুবাদে ভি. আই. পি কার্ড হোল্ডারদের সঙ্গে অন্যান্য বিচারকমণ্ডলীর মতন ঢুকেছিলাম কলেজস্কোয়ারে মণ্ডপের ভিতর। সেখানে এক কিশোরীর কথা শুনে চমকে উঠেছিলাম। সে তার বান্ধবীর গায়ে ঠেলা দিয়ে মহিষাসুরকে দেখিয়ে বলেছিল 'কি কিউট দেখেছিস একদম যেন অমুক সিনেমার তমুক বডিবিল্ডার হিরো, আই লাইক দিস টাইপ অফ হিম্যান'। কার্তিক 'হ্যান্ডসাম', গনেশ 'ফানি', সরস্বতী 'জলি', লক্ষ্মী 'গর্জাস'। এরপর ও কি শারদোৎসব নিয়ে পুরাণের কল্পকাহিনীকে ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরিয়ে আনা উচিত না প্রয়োজন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের প্রবাদপ্রতিম কণ্ঠে মহালয়ার শারদপ্রাতে 'মহিষাসুরমর্দিনীর' স্তোত্রপাঠ?

লিখতে বসে দুপুর গড়িয়ে গেল, আবহাওয়াটাও সুন্দর, একটু মেঘ, একটু রোদ্দুর, ঠিক আমার মনের মতই। মাথার মধ্যে বহু চিন্তা জট পাকিয়ে আছে, যেন সবই কলমের এক খোঁচায় বেরিয়ে আসা চাই। বৎসরান্তে আত্মজৈবনিক সালতামামীর সুযোগ এনে দিল 'আশুতোষ কলেজ পত্রিকা' তাই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমার শারদীয়ার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সন্ধে হয়ে আসছে। শহরে এখন পুজোর গন্ধ ম ম করছে। নতুন গানের ক্যাসেট বাজছে দোকানে দোকানে। মণ্ডপে মণ্ডপে আলো জ্বলে উঠেছে। কারগিল যুদ্ধ, অমর্ত্যর নোবেল জয়, গাইশাল রেল দুর্ঘটনা দখল করে নিয়েছে মহানগরীর আলোকসজ্জার পটভূমি। রাত পোহালেই দেবীর বোধনের মাঙ্গলিকক্ষণের আবির্ভাব হবে। জামাকাপড়ের দোকানে এখনও ভিড়। হোর্ডিং ব্যানার, ফেস্টুনে সুসজ্জিত নগরীর গলি থেকে রাজপথ। চিরদিনের চেনা শহরটা যেন কেমন অচেনা লাগছে। এর যেন মস্তিষ্ক নেই, বোধ নেই, অনুভূতি নেই। কবন্ধের ন্যায় এই শহরে শারদোৎসব আসছে, আসবেও। কিন্তু কোথায় সেই ঢাকের আওয়াজ? মন কেমন করা দশমীর বিকেল যখন ঢাকের বিষাদঘন কাঠি সুর তুলেছে— 'ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন'। ঢাকেরও মি মন নেই? ঢাকও কি পণ্যবাদী ধাঁ চকচকে বিপণনতা ও যান্ত্রিক কলকাতার ব্যস্ততা, গতিময়তা ও কৃত্রিমতার মাঝে হারিয়ে ফেলল তার সহজাত, অনুভবী মননটি?

অভিভাবক এবং সমাজপতিরা শুনছেন কি??

অভিষেক গুহ

অর্থনীতি (সাম্মানিক) প্রথম বর্ষ

বিংশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে দিকে দিকে চলছে প্রকৃত দিশারীর প্রচণ্ড খরা। মুক্ত অর্থনীতির খোলা জানলা দিয়ে গরীব দেশের বুকে লিপ্‌স্টিক্, কেনটাকি ফ্রায়েড চিকেন এবং স্কচ্ Whishky-র মতো বিলাস সামগ্রী ঢুকে পড়েছে। নেতারা ন্যাতা হয়ে টু পাইস কামাবার এমন খেলায় মেতেছেন যে কেউ গেছেন জেলে অন্যরা জেল বাঁচাবার জন্য আদালতে অথবা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অপচেষ্টায় এতই ব্যস্ত যে তাদের দেশসেবার কাজ কর্ম্ম লম্বা লম্বা বুলির আড়ালে শিকেয় উঠেছে। কবিগুরু থাকলে কান্নাভরা কণ্ঠে বলতেন'

"কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীত হারা
অমাবস্যার কারা"

আমাদের গুরুজনেরা শিশুদের শৈশব, কিশোরদের কৈশোরের আদ্যশ্রাদ্ধ করে তরুণ প্রজন্মকে স্টেফীগ্রাফ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় হবার বা আই.আই.টি-র ইঁদুর দৌড়ে নামিয়ে দিয়েছেন। এই মরীচিকার পিছল পথ শেষে ক্লান্ত ভগ্ন হৃদয় তরুণেরা

"হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায়, কোথায় কারার দ্বার"

আজকের এই Nuclear Family-র যুগে শিশুরা তাদের দাদু দিদা বা ঠাকুরদা ঠাকুমার আদি ও অকৃত্রিম ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। চার বছর বয়সে তাদের বিভিন্ন Nursery স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। ঠাকুরমার ঝুলির বদলে তাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় ফেমাস ফাইভ (Famous Five) যাতে তারা ইংরেজীটা ভাল শেখে কিন্তু কেউ এটা বোঝে না কিংবা বুঝেও বুঝতে চায়না যে হয়তো শিশুদের কাছেঠাকুরমার ঝুলিই অনেক প্রিয়, অনেক আপন। স্কুলের পর অভিভাবকেরা তাদের নিয়ে যান বিভিন্ন ক্রিকেট বা টেনিস কোচিং সেন্টারে এখানে তাদের সবসময় বলা হয় কপিল দেবের দৃঢ়তার কথা, স্টেফী গ্রাফের পরিশ্রমের কথা এবং সৌরভের সাফল্যের কথা এবং তাদের বারংবার মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে তাদের কোচিং সেন্টারে ভর্তি করানোর মূল উদ্দেশ্যটাই হল যে তাদেরও যে ভাবে হোক সৌরভ বা স্টেফীর মতো সাফল্য লাভ করতে হবে।

বিধ্বস্ত অবস্থায় যখন শিশুটি বাড়ি ফিরে আসে তখন তাকে আবার পড়তে বসতে বলা হয়। এখানেও তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে তাকে ক্লাসে প্রথম হতে হবে এবং অদূর ভবিষ্যতে তাকে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার না হতে পারলে তার জীবনটাই বৃথা হয়ে যাবে। যখন এই শিশুটি/কিশোরটি যৌবনে পা রেখে দেখে যে তাঁর সমস্ত উচ্চাশা শুধু উচ্চাশাই থেকে গেছে এবং তাকে ঘিরে তার অভিভাবকদের সমস্ত অলীক স্বপ্ন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে তখন সে চূড়ান্ত হতাশার শিকার হয়। তার সাথে সাথে আগুনের ঘৃতাহুতির মতো চারিদিক থেকে বর্ষিত হয় ধিক্কার ধ্বনি। হতাশার শিকার হতভাগ্য তরুণটির একমাত্র আশ্রয় স্থল হয়ে ওঠে ড্রাগের ছলনাময়ী আমন্ত্রণ।

কবি নবীনচন্দ্র সখেদে বলেছেন "ধন্য আশা কুহকিনী"। এই আশাই আবার আজকের অভিভাবকদের উচ্চাশায় পরিণত হয়ে কিভাবে আমাদের দেশের শিশুদের শৈশব, কিশোরদের কৈশোর এবং তরুণদের তারুণ্যকে তিলে তিলে হত্যা করছে তা সামান্য পর্যবেক্ষণেই ধরা পড়ে। তা দেখে চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা করে— কু "আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়"।

অভিভাবক এবং সমাজপতিরা শুনছেন কি? তাঁরা কি প্রকৃত দিশারী হতে পারেন না? তাঁরা কি বলতে পারেন না যে

তুমি ক্রিকেট টেনিস খেল শচীন, স্টেফী হওয়ার জন্য নয়, খেলো খেলোয়াড় সুলভ মানসিকতা অর্জনের জন্য। পড়াশোনা করো, অজ্ঞতার গহন অন্ধকার দূর করার জন্য। প্রত্যেককেই যে ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। মনে রেখো— "Life is not an empty Dream"। টলস্টয় তাঁর কালজয়ী উপন্যাস ওয়ার এন্ড পিস্-এ বলেছেন "The Most Essential thing but the most difficult one is to love life" এবং জীবনকে ভালবাসতে হলে চাই আন্তরিক প্রচেষ্টা যা কোনদিন বিফলে যায় না। তাইতো কবিগুরু বলে গেছেন—

"জীবনে যত পূজা হল না সারা,
জানি হে, জানি তাও হয় নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে পড়েছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা,
জানি হে, জানি তাও হয় নি হারা।।"

"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!"

—নজরুল

"শোন্‌রে মালিক, শোন্‌রে মজুতদার,
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়,
হিসাব কি দিবি তার।"

—সুকান্ত.

The True Essence of Womanhood— Motherhood— The First Act?

Tanya Sikdar
Statistics (Hons.), 2nd. Year

A worm cosy Monday. I was rushing back from my tuition. A 'mother'— the word has social overtones—was walking down a street with a child of 5 years who happened to be religiously savouring a lollipop. A little boy of the same age— a dirty beggar whose eyes were brimmed with the darkness of ignorance— came up to this 'mother' and asked for some coins. The woman at first did not pay heed to him. When he started persisting, she abused him and pushed him aside. Do we ever think where we are standing? On the threshold of entering the 21st century— a more so-called modern civilization— have we forgotten what morality actually means? Anybody, any x, y, z can give formal education but to lead a peaceful and happy life, we need a good moral upliftment through informal education— whole of which comes from the surroundings. We yell at the top of our voices claiming ourselves to be in the educated strata of the society. Is this education where we give 'gaalis' to an innocent child? Some people fight against child labour while others harbour protests against it subtly by keeping child servants at their places. This 'motherhood' does not hold good, the true essence of the word cannot be implied when a biological mother denies the motherly affection and love to other children which she gives to her child. This 'mother'— did she think how her child would feel if he were treated that way? Each mortal has a right to dream but circumstances deprive him from achieving those dreams a child has dreams which each one of us can fulfil. Their desires are limited. Is it our moral value that gives us the idea of 'showing off' in front of people who have nothing? Do we think of the frustrations and hatred towards the society that is bottling up inside the beggar child which leads him to criminal deeds? Just giving birth to a child does not make a woman a mother. A mother is an idol to be worshipped, an earthly being who has the deeper feelings of love, care, sacrifice and affection for all, a woman who is ready to cross all hurdles to face her life. The deeper meaning of the word is what we should understand. A mother is the infra— structure of the society— she makes it progress or hinders its development— for she is the foundation of a child. A world is a stage where men and women play their roles and a woman has different roles to act out. A woman teaches a child to its full bloom with good moral upbringing. In this flimsy social confinement, there are very few relationship which we are a basket joining two hearts. I am not critisizing the literary aspect of motherhood but hinting at the artificiality of the word nowadays. is anybody listening?

ধাতু দূষণ

স্নেহাশীষ দাস
বি.এস. সি. — প্রথম বর্ষ

যে সমস্ত মৌল সাধারণ অবস্থায় কঠিন, উজ্জ্বল, ভারী, তাপ ও বিদ্যুতের সুপরিবাহী তাদের বিজ্ঞানের ভাষায় Metal বা ধাতু বলে। এতো আমরা সবাই জানি, আমরা এও জানি যে কৃষিকর্ম থেকে শুরু করে জীবনদায়ী ওষুধ, সকল ক্ষেত্রেই ধাতুর ব্যবহার হয়। ধাতু ছাড়া আমরা এই সচল সভ্যতার কথা কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু আমরা জানি না যে এইসব ধাতুগুলো মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেলে দূষনক্রিয়া শুরু করে।

পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে দিন দিন যে হারে পরিবেশে ভারী ধাতুগুলো মিশছে, তাতে জীবজগতের ক্ষতির সম্ভাবনাও বাড়ছে। প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় যে সমস্ত ধাতু বিরাজমান তাদের দুষণ ঘটানোর ক্ষমতা খুবই কম। অন্যান্য উৎস যথা বিভিন্ন সার কারখানা ও কলকারখানা নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থগুলো জলে মিশছে, বাতাসে মিশছে।

খাদ্যে, জলে, বাতাসে, মাটিতে ভারী ধাতুগুলো মেশার ফলে জীবজগতের অপরিমেয় ক্ষতি হচ্ছে। লেড, পারদ ও ক্যাডমিয়াম-এর মতো অত্যাবশ্যক নয় এমন ধাতুগুলো মিশছে জলে। সাধারণত মুক্ত অবস্থায় এরা যতটা না ক্ষতি করে, তার থেকে বেশী ক্ষতিকর হয় জলে দ্রবীভূত অবস্থায়।

● পারদ এমনিতেই বিষাক্ত তবে ডাই মিথাইল মার্কারি আরও বিষাক্ত। এই যৌগটি সরাসরি স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে। ফলে স্নায়ুদৌর্বল্য দেখা যায়। একটি ঘটনার কথা বললেই এর আন্দাজ পাওয়া যাবে। জাপানের মিনা মাতা সমুদ্রোপকুলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। হঠাৎ একরাতের মধ্যে মিনামাতা শহরের প্রায় পঞ্চাশজন লোক মারা গেলেন। একশজন লোক চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেলেন। তদন্তর পর জানাগেল যে প্রত্যেকেই সেদিন মাছ খেয়েছিলেন, আর ঐ মাছগুলি সমুদ্রে কোথাও ডাই মিথাইল মার্কারির সংস্পর্শে এসেছিল। ফলে বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল। কি ভয়ঙ্কর না? অথচ এই পারদ 'মারকিউরোক্রোম' নামক ওষুধে উপস্থিত।

● কম যায় না ক্যাডমিয়াম(Cd), একটি গবেষনায় দেখা গেছে যে জাপানে এক ধরনের অদ্ভুদ অসুখ হচ্ছে যার নাম 'ইটাই-ইটাই', এতে ফুসফুস ও কিডনির অসুখ হয়। জাপানের পরিবেশে ক্যাডমিয়ামের অবস্থিতি মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যাওয়ায় এই রোগের দেখা যায়।

● লেডও প্রচন্ড ক্ষতিকর ধাতু। লেডের মারাত্মক বিষক্রিয়ায় "প্লাম বিসম" নামে একধরনের অসুখ হয়। লেডের বিষক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বৈকল্য দেখা যায়।

● আরও একটি বিষাক্ত ধাতু হল আর্সেনিক। আর্সেনিক অক্সাইড (আর্সেনিরাস অক্সাইড) বিষাক্ত। সামান্য একটু শরীরে মিশলে অসুস্থতা থেকে মৃত্যুও পর্যন্ত ঘটতে পারে।

● কয়লা, কাঠ ইত্যাদি পোড়াবার জন্য যে মৌলটি পরিবেশে মিশছে, তার নাম ভ্যানডিয়াম, ইহা বিক্ষিপ্তভাবে মস্তিষ্কের ক্ষতিগ্রস্থ করে ও শ্বাস অঙ্গে প্রদাহ সৃষ্টি করে।

তাই একুশ শতকে প্রবেশের প্রাক্কালে ধাতুর ব্যবহারের পাশাপাশি ধাতু দূষণ ও বিষাক্ত ধাতুর নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের দিকে নজর রাখা প্রয়োজন।

Tau Physics

দেবদীপ কর

মৎসবিদ্যা (সাম্মানিক) প্রথম বর্ষ

Tau Physics অতি প্রাচীন, তিব্বতীয় লামারা প্রথম এই Physic'র প্রবর্তক বলে মনে করা হয়। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা লামাদের প্রাচীন তথ্যকে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত চিন্তাধারার মাধ্যমে Tau physics নামে প্রতিস্থাপিত করেছেন।

বর্তমানে Tau physics মানে বোঝায় wave physics। এই physics-এর মাধ্যমে কিছু কিছু অতি সাধারণ ঘটনা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন, চিন্তাকরা, স্মরণ করা, স্বপ্ন দেখা ইত্যাদি। যদিও এই সমস্ত ঘটনার বহুবিধ মতামত আছে, তবুও Tau physics এর তথ্যই বর্তমানে সমাধিক গ্রহনীয় এবং প্রমাণিত।

Tau physics এর মূল তথ্য হল আমরা প্রতি মুহূর্তে যে কাজ করি, যে কথা বলি, বা চিন্তাকরি, সমস্ত কিছুই wave আকারে space এর মধ্যে থেকেযায় এবং প্রতিটি wave এর frequency পৃথক। পরিষ্কার ভাবে বললে বলা যায় যে, 'A'-এর চিন্তাধারার wave কম্পাঙ্ক 'B' এর চিন্তার wave কম্পাঙ্কের থেকে আলাদা, কিন্তু কখনো যদি 'A' এর frequency 'B' এর সঙ্গে frequency 'র সঙ্গে coincide করে, তখনই A' র B'র কথা মনে পড়বে। যাকে বর্তমানে Telepathy বলা হয়।

যদি A, B এবং C প্রত্যেকে একই ধরনের কাজ করে, তবে তাদের প্রত্যেকের চিন্তার wave-frequency আলাদা হবে, কিন্তু খুবই নিকটবর্তী। একটি উদাহরনের মাধ্যমে সহজেই এর ব্যাপারটি বোঝান যেতে পারে। মনে করি, A, B ও C তিন বন্ধু একই সঙ্গে জোকস্ স্মরণ করার চেষ্টা করছে। Tau physics এর ভাষায় বলা যায় তারা এখনকার চিন্তার frequency কে space এ অবস্থিত জোকসের wave frequency-র সঙ্গে coincide করাবার চেষ্টা করছে এবং যখনই কোন একজনের frequency 'র সঙ্গে space এ জোক্সের frequency coincide করবে তখনই তার সেই জোকস্ মনে পড়বে। তার দ্বারা প্রদর্শিত জোকস্ অন্য দুজনের frequency কে coincide করার জন্য প্রভাবিত করবে। ফলে অতি সহজেই তাদেরও অন্যান্য জোকস্ মনে পড়বে। কারণ প্রতিটি জোক্সের wave frequency একে অপরের খুবই নিকটবর্তী। পরিষ্কার ভাবে বলতে গেলে বলা যায়, সমস্ত জোক্সের wave frequency, মনে করি, x ও y 'র মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেহেতু x, y এর খুবই নিকটবর্তী ($x \to y$), সুতরাং প্রতিটি জোক্সের wave frequency-র মধ্যে পার্থক্য খুবই ন্যূনতম কিন্তু নগন্য নয়। এই কারণেই আমাদের একটি জোকস্ মনে পড়লেই আরো অনেক জোকস্ মনে পড়ে। বা একটি গান মনে পড়লেই আরো অনেক গান মনে পড়ে। কোন কবিতার একটি লাইন মনে পড়লে অন্যান্য লাইনগুলিও মনে পড়ে কিংবা কোন পুরনো কথা মনে পড়লে তার সঙ্গে সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথাও মনে পড়ে।

স্বপ্ন দেখাকেও আমরা Tau physics এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারি। এখানে প্রথমেই বলে রাখা দরকার, Human mind সাধারণত তিনটি দশায় থাকতে পারে (a) conscious (সচেতন) (b) sub conscious (অবচেতন) (c) super conscious (অতি সচেতন)।

আমার বর্তমান প্রবন্ধে consus এবং super conscious mind সম্বন্ধে আলোচনার কোন সুযোগ নেই বলে সরাসরি sub conscious mind এবং Tau physics নিয়েই আলোচনা করছি।

মানুষ স্বপ্ন দেখে subconscious mindএ। তাই আমরা স্বপ্নে কোন কিছুকে সনাক্ত করতে পারি না, শুধু উপলব্ধি করতে পারি। কারণ conscious ছাড়া কোন জিনিসকে সঠিকভাবে সনাক্ত করা যায় না। মানুষ maximum আট সেকেন্ড স্বপ্ন দেখতে পারে। Tau physics অনুসারে আমরা তখনই স্বপ্ন দেখি যখন আমরা sub conscious mind এ নিজেদের অজান্তেই কিছু চিন্তা করি, এবং সেই চিন্তার frequency space এ অবস্থিত কোন wave frequency'র সঙ্গে coincide করে।

সুতরাং আমরা এমন কোন জিনিসকে স্বপ্নে দেখব না যা নিয়ে মানুষ আজ পর্যন্ত চিন্তা করেনি বা যার কোন অস্তিত্ব এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এখানে কিছু উদাহরণ দিয়ে বোঝান যেতে পারে।

অনেকেই স্বপ্নে বিভিন্ন পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তি বিশেষকে দেখতে পান কারণ sub conscious mind এ তার চিন্তার frequency স্বপ্নে দর্শিত ব্যক্তির চিন্তার wave frequency'র সঙ্গে coincide করেছিল।

স্বপ্নে অনেক সময় overlapping হয়ে থাকে। আমি একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ Washing Machine এ কাপড় ধুচ্ছে। এখানে প্রথমে আমরা sub conscious mind এর চিন্তাধারার frequency রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে coincide করেছিল এবং তার পরেই আমার চিন্তার frequency মেসিনে কাপড় কাচার frequency'র সঙ্গে coincide করেছিল। কিন্তু স্বপ্নের speed এত বেশি যে দুটি পৃথক পৃথক চিন্তার মধ্যবর্তী সময় আমাদের মস্তিষ্কে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না এবং একটি স্বপ্নহিসাবেই আমাদের মনে হয়। অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় একে অপরের সঙ্গে overlap করেছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে স্বপ্নের speed এত বেশি যে আট সেকেন্ডের মধ্যে স্বপ্নে কোন শিশুর জন্ম থেকে মৃত্যু, কিংবা পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে বর্তমান অথবা Amoeba থেকে মানুষের বিবর্তন পর্যন্ত উপলব্ধি করা যেতে পারে। অনেকেই স্বপ্নে ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। অর্থাৎ তার সঙ্গে ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা সে স্বপ্নে দেখতে পায়। এটা একটি বিশেষ ঘটনা, এখানে একটি সহজ উদাহরণের মাধ্যমে এই ঘটনাটি বোঝান যেতে পারে। আমি যদি আজকে মনেকরি যে আমার বন্ধু 'x' কে আমি বেড়াতে নিয়ে যাব, আমার চিন্তাধারা wave আকারে space'র মধ্যে থেকে যাবে। এখন 'x' এর subconscious mind এর frequcney যদি আমার চিন্তার frequency'র সঙ্গে coincide করে তবেই 'x' স্বপ্নে উপলব্ধি করে যে আমি তাকে বেড়াতে নিয়ে যাব।

এই Tau physics'র পরিধি এতই ব্যাপক যে এর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমাদের বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবুও আমি খুব সহজ সরলভাবে Tau physics সম্বন্ধে একটি মৌলিক ধারনা পাঠক বর্গের নিকট উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছি এবং কিছু বাস্তব ঘটনাবলী বা বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়েছি।

"হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজও চমৎকার?
আমিও তোমার মতো বুড়ো হব— বুড়ি চাঁদটারে
আমি ক'রে দেব কালীদহে
বেনোজলে পার ;
আমরা দু-জনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাব
জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।"

—জীবনানন্দ দাশ

Before Marriage Blood Test is very Essential— A scientific view

Dibyendu Banerjee
Botany (Hons.), 2nd Year

Now we are standing almost is the beginning of 21st century. We have almost reached the top position in science and technology. Not only the earth, we have bridled the whole universe. But it is shameful to say that, till now we are overcast by the darkness of superstition.

At present, in the time of wedding. Whether it is love marriage or arranged marriage we do not forget to demand the horoscope from both the bride and the groom. We think, if their horoscope match with each others then their married life will be happy and peaceful. But the conception is totaly unscientific. At present some scientists think that before marriage blood test of both the couple is very much essential. It has a scientific base and the following discussion will prove the truth.

In the year 1940 Landsteines and Winer invented that there was an antigen present in the R.B.C. (Red Blood Carpuscle) of human blood. They named this antigen as Rh-factor. These scientists did their experiments with a special race of monkeys called Rhesus monkeys.

They injected the blood of Rhesus monkey to the Guineapig, which develop antlibodies against Rh antigen. The blood sample from human beings were tested with serum from that guineapig. In some cases, it was found that no reaction took place. While in others there was severe reaction. It was clear that where there was reaction. Those persons possessed Rh antigen in their blood and in case of no reaction the person possessed no such antigen. Thus a person possessing Rh antigen in known as Rh-positive while one with out it as Rh-negative. No person possesses natural Rh-antibodies, it is only produced in response to Rh-antigen.

Rh-factor is directly related with a child birth. If a Rh-negative woman marriage a Rh-positive man then the blood of the embryo will be Rh-positive, due to heredity (because of father having Rh-positive factor and Rh-positive factor is a dominant charactor) In this case an antibody of Rh-antigen will be produced in the woman's (mother) body. The producing of antibody of Rh-antigen is called sensitized. In this case, the born child may be physically abnormal or highly anaemic but at the time of the birth of 2nd child the child must be physically and mentally abnormal or dead or dead after the birth. This disease is called **Erythro Blastosis Faetalis**. This happens because the mother is already sensitized. In the reverse case (in the woman is Rh-positive and the man is Rh-negative) the same incident will happen.

In this age we are well conversant with some diseases like Thalassemia, Haemophilia, Calour blindness etc. which are transmitted by heredity.

The abnormal human traits can be classified on the basis of their occurrance which are :

1. Physiological trait : e. g. Sickle cell anaemia, Alkaptonuria.

2. Mental trait : Mongoloid idiocy.
3. Pathological trait : Kline felter's syndrome.

The basic principle of Mendelian inheritance is applicable to human beings also. The pedigree analysis helps in knowing the method of inheritance of a particular trait. The following list gives some idea about the effects of heredity on different structures and systems in human beings.

Autósomal dominant trait :

1. Brachydactyly — short fingers.
2. Polydactyly — extra fingers on toe
3. Arthritis — stiffness of joints between bows or may be fusion of the bones.
4. Hungtingtons chorea — Nervous disorder.

Autosomal recessive trait :

1. Albinism — Melanin, skin pigments are not synthesized.
2. Thalassemia — Abnormal R.B.C.

Sex chromosomal dominant trait :

1. Absence of enamel of teeth

Sex chromosomal Recessive trait :

1. Haemophilia — Blood coagulation does not occur.
2. Red-Green colour blindness — Person fail to differentiate between red and green colour.
3. Neuritis optica — Progressive atrophy of the optic nerve.
4. Gower's disease — Muscular atrophy.

The following charts give some idea about the mode of inheritence of sexlinked recessive disease.

Case—I

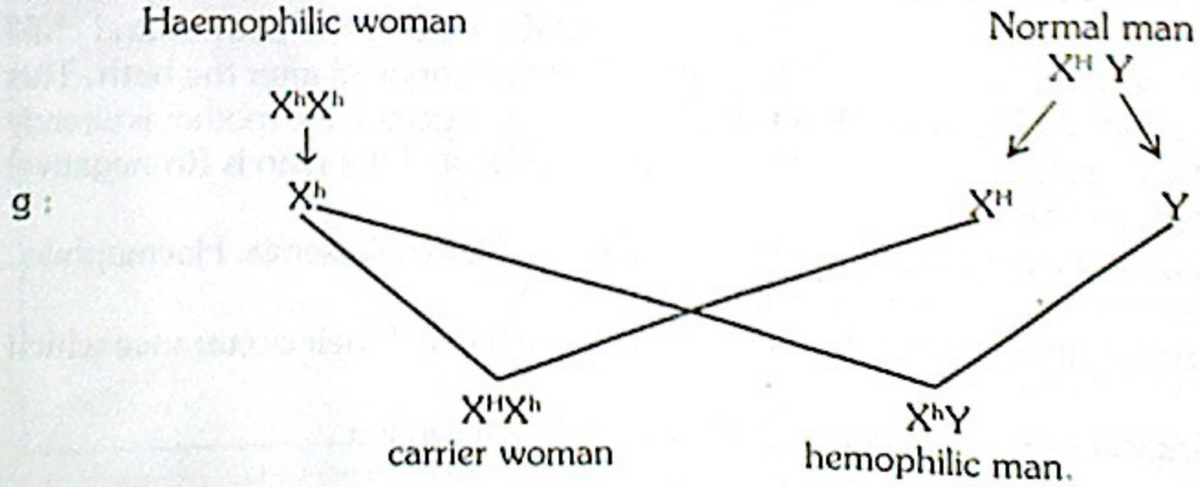

Case—II

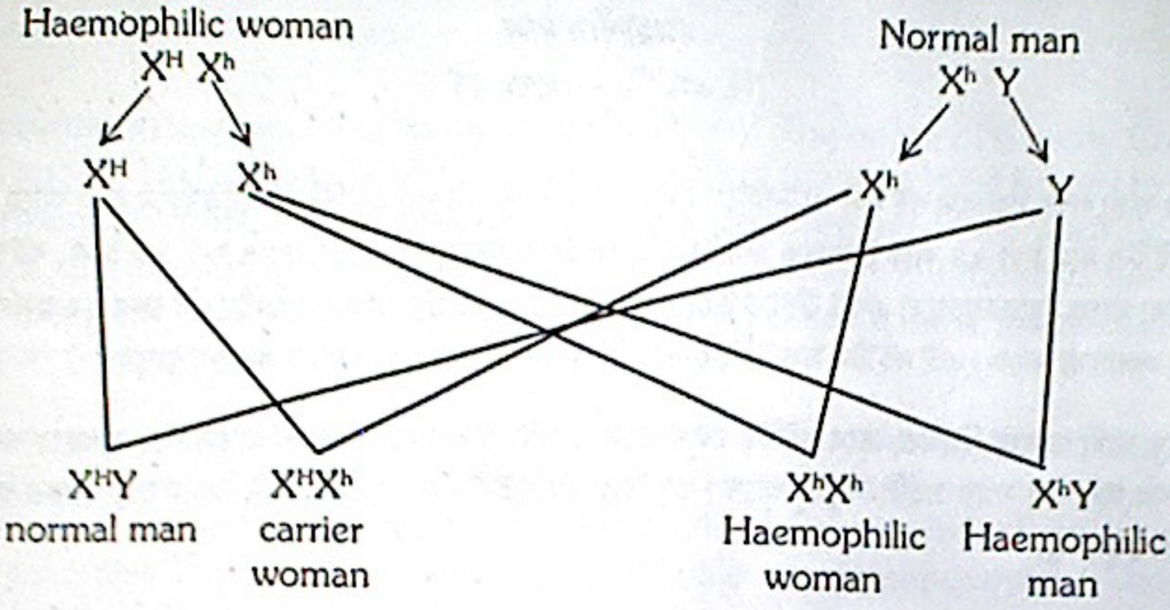

Now, we are very much conscious about a disease called A.I.D.S. (Acquired immuno deficiency syndrome), caused by a virus named H.I.V. (Human immuno deficiency virus). It is a most deadly disease of this century. Till now no specific treatment is invented to cure the disease.

This disease is transmitted by body fluid (like blood, semen etc).

If any one of the cauple is infected with this disease the other must be infected with this disease. If a pregnant woman is affected by this disease then the child will be born with such disease.

So it is very much important to prevent the disease early and it is possible through the blood test named ELIZH TEST.

So from the following discussion it is clear to us that to spend a happy and peaceful married life, blood test and genetic counselling is more essential than the horoscope.

"প্রেতলোকে যারা আনে প্রাণের স্বাক্ষর,
কর্ম আর চিন্তা যাদের জীবনে হরিহর,
* * *
তাদের আমরা চিনি। কিন্তু বুঝি না তাকে, দুধ ও তামাকে
সমান আগ্রহ যার,
দুনৌকার যাত্রী এই বাঙালী কবিকে,
বুঝি না নিজেকে।"

—সমর সেন

সবচেয়ে মূল্যবান বই

স্নেহাশীষ দাস
বি. এস. সি. — প্রথম বর্ষ

বিশ্বের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বই হল গুটেনবার্গের মুদ্রিত 'বাইবেল', যা পূর্ব জার্মানীর মিউজিয়ামে রাখা আছে। ভারতীয় মুদ্রায় এই বইটির দাম হল ২৪ লক্ষ টাকারও বেশি। এই বইটির ওজন ২৫ টন, উচ্চতা ৭ ফুট ১০ ইঞ্চি, বইয়ের পাশে একটি মই রাখা থাকে। যার সাহায্যে একটু উঁচুতে উঠে বইটি পড়তে হয়। বইয়ের পাতা ওল্টানোর জন্য ১২ হর্সপাওয়ারের একটি ইঞ্জিন লাগানো থাকে। এই বইটির মলাটটিতে ৪১০টি মুক্তো আর ১৮৬টি হিরে বসানো আছে।

বইটি জার্মানি ভাষায় লিখিত, তবে বইটির লেখাগুলো এতই ক্ষুদ্র যে তা পড়তে আতস কাঁচ ব্যবহার করতে হয়। বইটির সুরক্ষার জন্য সব সময় প্রহরী নিযুক্ত থাকে। শুধু তাই নয়, বইটির দেখার জন্য মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়।

বার্তাবাহী উদ্ভিদ

স্নেহাশীষ দাস
বি. এস. সি. — প্রথম বর্ষ

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে বেশকিছু উদ্ভিদ খনিজ উপস্থিতির কথা জানিয়ে জন্মায়। নির্দিষ্ট সেই সব উদ্ভিদরা যে জায়গাতেই জন্মায় বলা যায় যে সেখানকার মাটির তলায় আছে একটি নির্দিষ্ট খনিজের খনি যা ঐ উদ্ভিদটিকে জন্মাতে সাহায্য করেছে। একটি বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতি দ্বারা বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন।

বেলজিয়ামের '**গালমেই ভায়োনেট**' ফুল যেখানেই ফুটবে সেখানে মাটির নীচে আছে দস্তার খনি।

আমেরিকার '**লেড প্ল্যান্ট**' শুধু সীসা খনির আশেপাশে জন্মায়।

সোভিয়েতের '**কোকপোক**' ফুলের গাছ কেবল খনিজতেলের খনির উপর জন্মায়। এখানকার '**জিপসোফিলা**' বৃক্ষ তামার অস্তিত্ব জানাতেই সাহায্য করে। এরকম অস্তিত্ব জানিয়ে জন্মায় '**হাউমানিয়া**', '**স্ট্রাম কাটাশজেনসি**', ও '**বিসিয়াম হোমব্রেই**' নামক গাছরা। তামার পরিমাণ প্রতিগ্রাম মাটিতে যদি পাঁচ হাজার মাইক্রোগ্রামের বেশী থাকে তবেই এই সব গাছরা জন্মায়।

জার্মানির '**স্টার ফ্লাওয়ার**' টিন খনির পাশেই জন্মায়।

'**হাইড্রোনজিয়া ম্যাক্রোফিল্য**' অ্যালুমিনিয়াম খনির কাছে জন্মায় ফোটে নীল রঙের ফুল, অন্যত্র গোলাপী রঙের ফুল।

শুধু খনিজ পদার্থ নয়, অগ্ন্যুৎপাতের বিপদ সঙ্কেত জানায় জাভার '**রয়্যাল কাউন্সিল**' বা '**প্রিমুলা ইমপেরিয়ালিস**' গাছের প্রস্ফুটিত ফুল।

Calcutta to "KOLKATA" and West Bengal to "BANGLA"

Sourav Bhattacharya
B. Sc —

Recently a new issue has come to the forefront. The name of the city Calcutta has been proposed to change to "Kolkata" and the name of the state West Bengal to "Bangla". These dramatic changes of the name of the city Calcutta and State West Bengal have evoked a question in the minds of those who think about it seriously. Some people accept these proposed changes while others vote against it. It is interesting for us to enter into this debate and look into it little closely.

The opponents think whether these changes can cause any improvement to the life of the people of West Bengal, whether the poverty line will decrease to anoptimum level, whether these convertion can save the streets of Calcutta from being water logged during rain, can it inspire as smile in the lips of millions of unemployeds. Thousands of questions are bubbling in the eyes of the people.

On the other hand, to take a positive point this is the right time to change the name of Calcutta and West Bengal as the city Madras and Bombay has already been altered to Chennai and Mumbai.

But those stallmerts are forgetting that those cities are Y2K marked cities. A lot of strict rules are applied in those cities while implication of those rules are quite impossible for so many reasons in West Bengal and in Calcutta also.

This new convertion undoubtedly enables the people of West Bengal to think in a new way. These proposed changes also may hurt the minds of the people who have come from East Bengal. And it may also cause numerous side effects. For these reasons Let it be "Calcutta" and "West Bengal".

"যে মানুষ গান গাইতে জানে না যখন প্রলয় আসে,
সে বোবা ও অন্ধ হয়ে যায়,
তুমি মাটির দিকে তাকাও সে প্রতীক্ষা করছে।
তুমি মানুষের হাত ধরো সে কিছু বলতে চায়।"

—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কিছু হারানো দিনের কথা, কিছু আশা

হেরম্ব মৈত্র
ইতিহাস (সাম্মানিক) দ্বিতীয় বর্ষ

ঠিক যে কবে আশুতোষ কলেজে এসে ফর্ম তুললাম, ঠিক যে কবে ভর্তি হলাম, ঠিক যে কবে প্রথম ক্লাস করলাম আজ আর তা মনে নেই। হয়তো আমারই দোষ লিখে রাখা উচিত ছিল। কারণ এ অলস মস্তিষ্কে অনেক কথাই খেয়ালে থাকে না। ঠিক করেছিলাম উচ্চ-মাধ্যমিক আর্টস নিয়ে পড়বো। অনেক স্কুল-কলেজ থেকেই ফর্ম তুলেছিলাম, কিন্তু এগারো ক্লাসে ভর্তি হলাম আশুতোষেই। সেই নাকতলা স্কুলের পোষাক ছেড়ে ভিন্ন পোষাকে প্রবেশ। আজ আমি প্রথম বর্ষের সাম্মানিক ইতিহাসের ছাত্র। দু'বছর যে কিভাবে কেটে গেলো ভাবতেই অবাক লাগে। 'সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়'। আজ বহু ঘটনাই স্মৃতির পাতা থেকে মুছে গেছে। তুব আজো কিছু ঘটনা মনে পড়ে।

স্মৃতির বহুলাংশ দখল করে আছেন, ডঃ শুভঙ্কর চক্রবর্তী। আমাদের কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। বর্তমানে যিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। প্রবল প্রতাপশালী এই মানুষটি ছাত্র সমাজে একাধারে শ্রদ্ধা ও ভয়ের পাত্র।

দক্ষ প্রশাসকের মতো তিনি কলেজ পরিচালনা করতেন। দক্ষ মাঝি যেমন উত্তাল সমুদ্রে নৌকাকে সর্বদা রক্ষা করে চলে, তেমনি তিনি কলেজ পরিচালনা করতেন। কতিপয় ছাত্র হয়তো করিডোরে দাঁড়িয়ে ক্লাস চলাকালীন গল্প করছে, শুভঙ্কর বাবুকে দেখতে পেলেই সকলে ছুটে পালাতো। কোন ছাত্রই কলেজে যা খুশি করার সুযোগ পেতো না। তিনি শুধু ছাত্রদের শাসনই করতেন না, তাদের ভবিষ্যত জীবনেরও পথ-প্রদর্শক ছিলেন। এর জন্য তিনি বহু কাজ ও প্রচার করে গেছেন তা সজ্জন সুবিদিত।

সমাজে তার সমালোচকও কম নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের পোষাক নিয়ে তিনি নাকি মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছেন। এর জন্য সংবাদপত্র গুলোও তাঁর কম সমালোচনা করেনি। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় কলেজ জীবনে রুচিসম্মত পোষাক পরাই যুক্তিযুক্ত। এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর পদক্ষেপ প্রশংসনীয়। অধিকাংশ মানুষই যাঁর প্রশংসায় মুখর সংবাদপত্র তাঁর কৃতিত্বকে কখনই ছোট করতে পারে না।

আজ তিনি আর কলেজে নেই। এতে ছাত্রদের আক্ষেপ কম নয়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আজ সোনা ফলানোর কাজে ব্রতী। পরম করুনাময়ের কাছে প্রার্থনা করি এই ছাত্রদরদী মানুষটির কাছ থেকে ছাত্রসমাজ যেন আরো উপকার পায়।

এবার আমি কলেজ ইউনিয়ন প্রসঙ্গে আসি। সাধারণত মানুষের মনে ধারনা থাকে কলেজ ইউনিয়ন মানেই মারামারি, বিশৃঙ্খলা, দাদাগিরি, পার্টিবাজি। কিন্তু আমাদের ইউনিয়ন এসবের থেকে মুক্ত। সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমরা পেয়েছি যোগ্য ছেলেদের। কলেজকে ভালোবেসে ও মধুর ব্যবহারে এরা ছাত্রদের মন জয় করেছে। বর্তমান সম্পাদকও এ ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে।

আশুতোষ কলেজ আজকে কলকাতা— বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকা একটি নামজাদা কলেজ হিসাবে গণ্য হয়। উচ্চমাধ্যমিক ও সাম্মানিক স্তরের প্রত্যেক বিষয়েই ছাত্ররা ভালো ফল করে। আশুতোষ কলেজের নিয়ন্ত্রণে থাকা 'কমপিউটার শিক্ষা কেন্দ্র'টি দূর-দুরান্তের ছাত্রদের আকৃষ্ট করে। এখানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। এ নিবন্ধ লিখতে গিয়ে আজ আমাদের দর্শন বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কালীপদ বক্সি ও পূর্ণচন্দ্র মুখার্জী-র কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। এঁদের পড়ানোর দক্ষতা ছাত্রদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতো। এঁদের ছাত্রপ্রীতির কথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। এঁদের অনুপস্থিতিতে দর্শন বিভাগ আজ অনেকটাই শূন্য। এছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এ ছাড়া এ বিভাগের অধ্যাপক সুকান্ত আচার্য্যের বহু মূল্যবান পরামর্শ আমার ছাত্র জীবনের পাথেয় হয়েছে।

আশুতোষ কলেজের এ স্বর্ণযুগের সময় কিছু সমালোচনা না করলে হয়তো আমার এ লেখার অপূর্ণতা প্রকাশ পাবে। আজকাল কিছু কিছু ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায় ক্লাস চলাকালীন করিডোরে দাঁড়িয়ে জোরে কথা বলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। ফাঁকা ঘরে বেঞ্চের উপর পা-তুলে বসে গল্প করা, দেওয়ালে কুৎসিৎ কথা লেখা ও পান-গুটখা খেয়ে তার পিক্ ফেলা, হয়তো বা বলার লোকের অভাব, তবু ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলি এ কলেজ তোমার, আমার, সবার, একে সুন্দর রাখার দায়িত্ব সকলের। আজ আমরা ছাত্র কিন্তু একদিন আমরাই সমাজের দায়িত্ব পাবো, অতএব এখন থেকেই আমাদের উপর অনেক দায়িত্ব। নয়তো আগত যুগের ছেলেরা আমাদের ক্ষমা করবে না, কিছু আমাদের তাদের জন্য রেখে যেতে হবে। এ বয়সে সব ছাত্রের উচিৎ খেলাধুলা করা। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতির বই পড়া ও তা আলোচনা করা। অবসর সময়ে সমাজসেবা করা। সর্বদা রসাত্মক যৌন আলোচনাপূর্ণ বই থেকে দূরে থাকা ও কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গিপূর্ণ নাচগান যুক্ত সিনেমা দেখা বন্ধ করা। ছাত্র জীবনে এগুলো আফিঙের মতো কাজ করে। হয়তো একটু বেশি উপদেশ-ই দিলাম।

একদিন আমাদের-ও কলেজ ছেড়ে দিতে হবে। উচ্চশিক্ষা বা চাকরির জন্য অন্য কোথাও যেতে হবে। আমাদের জায়গা পূরণ করবে নতুন ছাত্ররা। আশুতোষ কলেজ যেমন আছে তেমনই থাকবে। আমার মনের কোণে আশুতোষ কলেজ সদাসর্বদা অবস্থান করবে দীপ্তি সহযোগে, কলেজ আমাকে যথেষ্টই দিয়েছে। কিন্তু আমি কিছুই দিতে পারিনি কলেজকে।

প্রত্যেকদিন কলেজ শেষ হলে পড়ন্ত বেলায় আশুতোষ কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে তাকে করি প্রণাম, এবং মনে মনে কবিতা উচ্চারণ করি ঃ—

"বর্ষে বর্ষে দলে দলে
আসে বিদ্যামঠ তলে
চলে যায় তারা কলরবে..."।

"কোথায় চলেছে সব?
পায়ে পায়ে কার ছায়া কাঁপে?
দু'হাতে মৃত্যুর মুখ ঠেলে ঠেলে দল বেঁধে
যাবে বুঝি অজানা উজানে?
শহরে কিসের বাঁশি করেছে আকুল?
জানে না কো অথবা জেনেও বুঝি নির্ভয়ে চলেছে
সবাই দল বেঁধে দলে দলে বাঁচার আশায়।"

—অমল চক্রবর্তী

"পুজোর গানের সেকাল, একাল"

পরন্তপ

কি জাদু বাংলা গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে।' বাঙালি, সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। আর বাঙালির সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন হল বাংলা গান। বাঙালির দুর্বলতা বাংলা গান, বাঙালির গর্ব বাংলা গান। বাংলা গানের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পাতা ওল্টালে আদি পর্বের ইতিহাসের সুপ্রাচীন চর্যাপদ থেকে শুরু করে আজকের আধুনিক গানের ধারা পর্যন্ত যে সুদীর্ঘ গতিপথ বাংলা গান অতিক্রম করে এসেছে তা প্রকৃতই গর্বের বিষয়। বাঙালির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতিটি অনুষঙ্গেই নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে বাংলা গান। কিন্তু একুশ শতকের দোরগোড়ায় এসে এখন অধিকাংশ শ্রোতার মনেই একটি সহজাত প্রশ্ন জেগেছে এই দশকের বাংলা গানে কি পূর্বের মতন সেই জাদু আছে? রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলপ্রসাদী, রজনীকান্তের গান, বাউল ও লোকগীতি, গণসঙ্গীতের সমান্তরালে পঞ্চাশ, ষাট, সত্তরের দশকে বাংলা গানের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক জোয়ার বয়ে এনেছিল বাংলা আধুনিক গান বিশেষতঃ পুজোর গান, যা আজও বাঙালির স্বপ্নের গান, গর্বের নস্টালজিয়া।

আজকের বাংলা গান বহুলাংশে রি-মেক নির্ভর হয়ে পড়েছে। বাংলা গানের ভাগ্যাকাশে এখন কেবলই শূন্যতা। একটির পর একটি পুজো আসে, চলে যায়, আবারো আসে। বাঙালির হৃদয়ের অপূর্ণতা বর্ষিত হয় বাংলাগানের শূন্যতার কথা ভেবে। বাঙালি এখন বেঁচে আছে তার পুরোনো প্রেম-ভালোবাসা-আনন্দ-বেদনা-সুখ-দুঃখের বাংলা গানের স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে। রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতির পাশাপাশি সলিল চৌধুরীর সুর, শচীন কর্তার সুর, সুধীন দাশগুপ্তের সুর, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীত রচনায় হেমন্ত, মান্না, শ্যামল, সতীনাথ, মানবেন্দ্র, দ্বিজেন, অখিলবন্ধু, কিশোর, সুবীর, সন্ধ্যা, প্রতিমা, আরতি, লতা, আশা, গীতা দত্ত, রফি, মুকেশের গান এখনও আমাদের মনের ঝাড়বাতিতে আলোর রোশনাই এনে দেয়। কিন্তু সেই সব মন কেমন করা গান এখন হারিয়ে গিয়েছে। এখন যুগ এসেছে সস্তার, তারল্যের।

সাম্প্রতিক কালের বাংলা গানে বিশেষতঃ পূজোর গানে যে রি-মেক সংস্কৃতির সূত্রপাত ঘটেছে তাকেই সম্বল করে আধুনিক গায়ক-গায়িকাদের গর্বে বুক ভরে ওঠে। কিন্তু কেন এই রি-মেক নির্ভরতা? প্রশ্ন জাগছে সুর ও গান পাগল শ্রোতাদের মনে। একটু খতিয়ে দেখলেই পরিস্কার হবে যে এই রি-মেক সংস্কৃতির নেপথ্যে আছে ভালো গীতিকার ও সুরকারের অভাব। যে কজন গীতিকার গান লিখছেন, সুরকার সুর দিচ্ছেন তাঁরাও স্বর্ণযুগের হৃদয় উথাল-পাথাল করা গান তৈরী করতে পারছেন না। গায়ক-গায়িকাদের কণ্ঠেও নেই পূর্বেকার সেই সুরধ্বনিতা। তাই অনুপম ঘটক, শচীনদেব বর্মন, রবীন চট্টোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গুপ্ত, সুধীন দাশগুপ্ত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, পুলক বন্দোপাধ্যায়ের মতো সুরকারদের বিকল্প আমরা পাই নি। কাজেই স্বর্ণযুগের গৌরোবজ্জ্বল সময়ের অনতিবিলম্ব পরেই বাংলা গানের প্রেক্ষাপটে নেমে এসেছে হতাশার যুগ। এই বন্ধ্যাত্ব নেমে এসেছে আধুনিক গান, পূজোর গান এমনকি ছায়াছবির গানেও।

পঞ্চাশ, ষাট এবং সত্তরের দশক ছিল বাংলা গানের সুবর্ণযুগ। সে সময়ের চলচ্চিত্রও সমৃদ্ধ ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতির সমান্তরালে আধুনিক গানে। আর পুজোর গান নিয়ে তো কোন মন্তব্যের অবকাশ নেই কেবলই শোনার এবং মুগ্ধ হওয়ার অপেক্ষা। গল্প শুনেছি শনিবার দুপুর ১টা ৪০ নাগাদ আকাশবাণী থেকে সম্প্রচারিত হত পুজোর নতুন বাংলা গান। কি শিহরণ সৃষ্টি করত সেইসব গান! কি জনপ্রিয় ছিল সেইসব অনুরোধের আসর। অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ ছুটির শেষে স্কুলপড়ুয়া ছাত্র থেকে শুরু করে অফিসের বড়বাবু সমবেত হতেন ধর্মতলার জনপ্রিয় রেডিওর দোকানের সামনে। পাড়ায় পান, চায়ের দোকান উপচে পড়ত সেইসব গান শোনার তাগিদে। এমনই জনপ্রিয় ছিল সেই 'সোনা রোদের গান, সবুজ পাতার গান'। গায়ক-গায়িকারাও তাঁদের গায়কীতে সুর, লয় তার সঙ্গে নিজ সত্তাটিকে মিশিয়ে এক অপূর্ব সুরমূর্চ্ছনা সৃষ্টি করতেন। কিন্তু আজ কোথায় গীত রচনায় সেই কাব্যময়তা? গীতরচনায় স্থান পাচ্ছে কেবলই অসংলগ্ন কিছু শব্দ। স্থূল, তরল শব্দে ভরপুর আজকের গান। গীতিকার ও সুরকারের মানসিকতাও সমান নয়। আজকের অধিকাংশ

গীতিকার, সুরকারদের, ক্যাসেট নির্মাতাদের একটিই উদ্দেশ্য যেনতেন প্রকারেণ কিছু শব্দকে কোনমতে একটি সুর লাগিয়ে কত বেশী মুনাফা অর্জন করা যায়। সাম্প্রতিক বাংলা গানে উৎকর্ষতার চাইতে বানিজ্যিক স্বার্থই বেশী স্থান করে নিচ্ছে। যে কজন মুষ্ঠিমেয় স্বনামধন্য পুরোনো গীতিকার আছেন এখন তাঁরা কেবল গান সাপ্লায়ারে পরিণত হয়েছেন। বহু নামী-অনামী গায়ক, গায়িকা, গীতিকার ও সুরকার এখন বাজারময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এরই পাশাপাশি ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে বিভিন্ন ক্যাসেট কোম্পানী। বাংলা গান এখন অনেক বেশী যন্ত্র নির্ভর। সুরমাধুর্য গৌণ হয়ে যন্ত্রানুসঙ্গই মুখ্য হয়ে উঠেছে। যন্ত্রের কানফাটা শব্দ একদিকে যেমন শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষতি করে, অন্যদিকে শ্রোতাকে শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত করে তোলে। কিছুদিন আগে বাংলা আধুনিক ও পুজোর গানে একটি চটকদার অধ্যায় যুক্ত হয়েছে 'জীবনমুখী গান' তকমা এঁটে। যন্ত্রের কানফাটা আওয়াজের তালে তালে সস্তা, চটুল কিছু শব্দকে দ্রুত উচ্চারণ করে গেলেই জীবনমুখী গান হয়ে গেল। গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সুরকার শ্যামল গুপ্ত, অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবী বছরখানেক আগে একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন বিশেষ কিছু গায়কের গাওয়া গানকেই 'জীবনমুখী' আদৌ বলা যায় কি না। প্রসঙ্গতঃ জীবনমুখী-গান'এর অর্থ এমন গান যা মানসিক, শারীরিক অসুস্থ মানুষকে জীবনের উৎসমুখে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে, যা আমাদের প্রতিকূল প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার মোকাবিলা করার প্রেরণা যোগায় এমন গানকেই 'জীবনমুখী' বলা যেতে পারে। নব্বইএর দশকের মাঝে এসে কিছু গানকে 'জীবনমুখী' বলে প্রচার করার উদ্দেশ্য থাকতে পারে দুটি কারণে— এক) অস্তিত্বের সঙ্কটের দিক থেকে শ্রোতার দৃষ্টিকে বিচ্যুত করার, দুই) পুজোর গানের মন্দার সময়ে স্বঘোষিত একটি চটকদার অধ্যায় সংযোজনের। জনমানসে প্রশ্ন জেগেছে তবে কি বাঙালির শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, দ্বিজেন্দ্রগীতি, রামপ্রসাদী, অতুলপ্রসাদী, রজনীকান্তের গান, আউল বাউল ফকিরের গান, লোকগীতি, ভাটিয়ালি, গম্ভীরা, সারিজারি কিংবা গণসঙ্গীত এ সমস্তই মরণমুখী? বস্তুতঃ এই তথাকথিত জীবনমুখী গানই পুজোর গান তথা বাংলা আধুনিক গানের দৈন্যটুকুকে বড় প্রকট করে তোলে। জীবনমুখী গানের পাশাপাশি পুজোর গানের রি-মেক নির্ভরতা বাঙালিকে হতাশ করছে। পুরোনো জিনিসের নকল যেমন বেশীদিন টেকে না, ঠিক তেমনি রি-মেক গানের শিল্পীদের আয়ুও বেশীদিন হতে পারে না। বিপুল পরিমাণ ক্যাসেট, গায়ক, গায়িকা, গীতিকার, সুরকারের প্রাচুর্য থাকলেও বাঙালি গান পাচ্ছে না। আটলান্টিক, সাগরিকা, সি. বি. এস, আশা অডিও প্রভৃতি কোম্পানীগুলো রি-মেক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। ব্যক্তিবিশেষের কাছে রি-মেক ও ভার্সন গান গ্রহণযোগ্য হলেও এর মাধ্যমে বাংলার সেই স্বর্ণযুগের পুজোর গান, তার জনপ্রিয়তা কি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে? সাম্প্রতিক কালে ইন্দ্রনীল, শ্রীকান্ত, সৈকত, মানসী, কুমার শানু, শম্পা কুণ্ডু, সহেলী, মধুশ্রী, মধুরিতা, অমৃতা প্রমুখ অনেক শিল্পীই আছেন যাঁদের অনেকেরই কণ্ঠ সুমিষ্ট, গায়কীও উত্তম, কিন্তু ভালো সুর, কথার অভাব থাকায় এঁদের কণ্ঠও নতুন কোন মাত্রা যোগ করতে পারছে না। ফলে আশির দশকের গোড়ার দিক থেকে পুজোর বাংলা গানে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। স্বর্ণযুগের পুজোর গানের নস্টালজিক দিনগুলোয় এইচ. এম. ভি., কলম্বিয়া প্রকাশ করত শারদঅর্ঘ্য— কালজয়ী গানের রেকর্ড। এবারও এইচ. এম. ভি. শারদোৎসবের প্রাক্কালে বহু ক্যাসেট প্রকাশ করেছে, কিন্তু বিকিয়েছে বেশী গীতাদত্ত, হেমন্ত, শ্যামল, আরতি, কিশোর প্রমুখ কালজয়ী শিল্পীদের কণ্ঠে গীত সেই পুরোনো দিনের গোল্ডেন এজের 'গোল্ডেন আওয়ারে'র গান।

কিন্তু আমরা শুধু নিন্দুক নই, আমরা শ্রোতা, ভালো-মন্দের দাবি জোরগলায় করার অধিকার আপনার, আমার আছে। আমরা আশাবাদী, যে খুব বেশীদিন এই বদ্ধ অচলায়তন থাকবে না। বাংলার পুজোর গানের মরাগাঙে জোয়ার আনতে গেলে ভালো গায়ক-গায়িকার পাশাপাশি ভালো গীতিকার ও সুরকারদেরও একসাথে এগিয়ে আসতে হবে। এই অভাব পূরণ হলেই পুজোর গান কেবল রি-মেক নির্ভর হয়ে থাকবে না, আগামী দিনগুলোতেও রচিত হবে আরো স্বর্ণযুগ। বাংলার প্রতিশ্রুতিবান, প্রতিভাময়, প্রতিভাময়ী শিল্পীদের খুঁজে নিয়ে ভালো গীতিকার, সুরকারের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটাতে পারলেই আবারো সেইসব হারানো গান নতুনভাবে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। 'বাংলা সঙ্গীত মেলা' ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে আমরা অনায়াসে চিনে নিতে পারি নতুন, উজ্জ্বল মুখদের। আজকের বদ্ধ অচলায়তন, হতাশা ভাঙতে পারে গায়ক, গায়িকা, সুর ও গীতিকার, ক্যাসেট নির্মাতা ও শ্রোতাদের সম্মিলিত প্রয়াস একুশ শতকের সেই উজ্জ্বল দিনের দিকে আমরা সাগ্রহে তাকিয়ে আছি যেদিন পুনরায় সার্থক হবে— 'কি জাদু বাংলা গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে'।

নজরুল জন্মশতবর্ষ স্মরণে ঃ নজরুলের চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা

পল্লব মুখোপাধ্যায়
উদ্ভিদবিদ্যা (সাম্মানিক) দ্বিতীয় বর্ষ

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন মহা আড়ম্বরের সঙ্গেই শুরু হয়েছে। এই পুণ্যলগ্নকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যেই দু বাংলাতেই নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ষব্যাপী কর্মসূচীর সূচনা হয়েছে। বাংলার সরকার কবির জীবনীগ্রন্থ ও রচনাবলী প্রকাশ করার উদ্যোগসহ আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের লক্ষ্য তখনই সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হয় যখন অতীতের সমান্তরালে নতুন প্রজন্ম ও নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার, বিশ্লেষণ, সমীক্ষা ও মূল্যায়নে ব্রতী হন।

কাজী নজরুল ইসলাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল ফসল। ঘটনাবহুল বর্ণময় জীবনধারার পাশাপাশি তাঁর সাহিত্যের আবর্তও বিচিত্র। বিদ্রোহের প্রতীক, প্রতিবাদের ভাষা তাঁর সাহিত্যে ভাস্বর। বিশ শতকের কুড়ি-তিরিশ-চল্লিশের দশকের উদ্বেল দিনগুলো তাঁর কবিতা, সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও অন্যান্য বহুবিধ রচনায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। নজরুলের কবিতা ও গানে সমসাময়িকতার সমান্তরালে নিহিত আছে সার্বজনীন সত্ত্বা। তাই একুশ শতকে প্রবেশের দ্বারপ্রান্তে এসেও বিশ শতকের কবি আজও মলিন নন, অপ্রাসঙ্গিক নন। আগামী শতাব্দীতেও তাঁর সাহিত্য সেই প্রাসঙ্গিকতা নিয়েই অধিষ্ঠিত থাকবে। আশৈশব নজরুল উদ্যমী অশান্ত, উপপ্লবী। গতানুগতিক পুঁথি ও প্রথাগত শিক্ষাকে তিনি সর্বোচ্চ বলে মনে করেননি, তাই সমাজ ও প্রকৃতির শিক্ষাকে তিনি অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছেন। তাঁর চরিত্রেই এক দ্বৈতসত্তার বিমূর্ত প্রকাশ সবিশেষ লক্ষ্য করা যায়;একাধারে অকুণ্ঠ মানবিক উদারতা, শীলিত অনুভব অন্যদিকে প্রকৃতির সংহারমূর্তির মতন বিপ্রতীপ মানসিকতার সন্নিহিত, অবস্থান। ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক ক্লেদের বিরুদ্ধে নজরুল সাহিত্য জ্বলন্ত জেহাদ। কবির জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন নানাদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। গোটা দেশ আজ সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত মদিরায় লিপ্ত। চারপাশে ধ্বংসের শব্দ, তান্ডব পৈশাচিক উল্লাস, অস্থিরতা। মন্দির-মসজিদকে কেন্দ্র করে টিকি ও ফেজধারীদের আস্ফালন! এই প্রেক্ষিতে নজরুল জন্মশতবর্ষপালন অত্যন্ত সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ। নজরুলের উদার, অমৌলবাদী, অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী রূপটি নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা একান্ত কর্তব্য।

নজরুল ইসলামকে নিয়ে বাংলা ও বাংলাদেশে প্রভূত গবেষণা চর্চা হয়েছে, হচ্ছে, ভবিষ্যতে হবেও। বাংলাদেশে নজরুল 'জাতীয় কবি' বলে একটু বিশেষ সম্মানের অধিকারী। বাংলাতেও নজরুলের স্মরণ-বন্দনা খুব একটা ধীর খাতে বইছে না। আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, নাট্যমঞ্চ কিংবা সাংস্কৃতিক পাটাতন থেকে শুরু করে মজলিস, জলসা কিংবা নিছক আড্ডার আসরেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিপূরক হিসেবে নজরুলগীতি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। গীতরচনা ও সুরসংযোজনার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের পরেই আমার মতে নজরুলের স্থান পাকা অবশ্য অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও তাঁদের কথা চিন্তা করে তবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

কবিতার ক্ষেত্রে যেভাবে কবির বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় অকপটে পাওয়া যায় গানের ক্ষেত্রে বরং শিল্প-সৌন্দর্যই আমাদের মনকে আকর্ষণ করে। যদিও তাঁর বিদ্রোহের সঙ্গীত ও কম ইঙ্গিতবাহী নয়। নজরুল কবিতা অর্থেই সাম্যবাদ, বিদ্রোহ বিপ্লব, গণচেতনা এই ধারায় ছবিগুলো চোখে ভেসে ওঠে। এই রচনা তথা অবিস্মরণীয় ভূমিকা কবিকে প্রতিস্থাপিত করেছে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের চালচিত্রে। সাহিত্যানুরাগীর ভাষায় রূপ রঙের উপভোগের প্রবণতা কতক সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে নজরুল কবিতা পাঠের ফাঁকে ফাঁকে। নজরুল কবিতা অনায়াসে আদায় করে নিয়েছে রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক তাৎপর্য। কোন কোন বিদগ্ধজন লেখার শেষে ভাষা ইত্যাদি প্রসঙ্গে দু-চার কলম মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন— তার মধ্যে আন্তরিকতা নেই, নেই কোনও এসথেটিকস্ প্রতীতি। নেহাতই দায়সারা কিছু মন্তব্য। সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে ঘোরা-ফেরার সুবাদে জেনেছি যে বাংলাদেশে নজরুল চর্চা অত্যন্ত সুসৃঙ্খলভাবে এগিয়েছে ও ব্যাপকতায় পর্যবসিত হয়েছে।

বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি ও ৬টি বই বেরিয়েছে। নজরুলের শব্দচয়ন বিষয়ে পুরোদস্তর একটি অভিধান প্রকাশিত হয়েছে। নজরুল আকাদেমি ও নজরুল গবেষণা ও পরিপুষ্ট সংগ্রংশালা গড়ে তোলার প্রয়াস চালাচ্ছে। আমাদের দেশেও নজরুল জন্মশতবর্ষে কাজী নজরুল ইসলাম স্মরণে ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে ভারতীয় ডাকবিভাগ।

নজরুল বন্দনার এহেন বহুবিধ উপচার সত্ত্বেও এপার-ওপার দু বাংলাতেই শুধু কবি শিল্পী হিসেবে নজরুলের বিচার বিশ্লেষণের ভাণ্ডার বোধহয় আশাতীত নয়। নজরুলের শব্দচয়নিকা অভিধান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও বিশিষ্ট সমালোচকদের প্রয়োজন আছে কবির সৃষ্টির প্রতিটি শব্দ ভেঙে ভেঙে তার সুর-রঙ-গন্ধ-স্পর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরার। ওপার বাংলার বিদগ্ধ লেখকগণও কবির শুদ্ধ কবি সত্ত্বাটিকে চিনে নেবার কাজটি সম্পূর্ণ করেননি। বলা বাহুল্য, এপার বাংলাতেও এজাতীয় শ্রমসাধ্য, মৌলিক কার্যক্রম গ্রহণে আন্তরিকভাবে কেউ উদ্যোগী হননি। একজন কবির স্থায়িত্ব কোথায় নিহিত থাকে কিংবা তাঁর প্রাসঙ্গিকতাই বা কতটুকু এ প্রশ্ন আজ নজরুল অনুরাগীমাত্রেরই অন্তরে জাগা উচিত। কেবলমাত্র নজরুলজয়ন্তী পালন কিংবা নজরুলের কবিতা বা গান শোনাতেই নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা শেষ হয়ে যায় না, গান বা কবিতা শোনা, পড়ার পরেও অনুভবী হৃদয়ে গাঢ় চিহ্ন এঁকে যায়। নজরুলের কবিত্বশক্তি জাতির জাগরণ ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। অনেক সমালোচক নজরুলকে চড়াগলার কবি, স্থূলতার কবি বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু, নজরুলের কবিতার যথার্থ শিল্পমূল্যের সন্ধান করলেই নজরুল কবিতার সূক্ষ্মতার পরিচয় মেলে। আমার কৈফিয়ৎ কবিতার পরিহাসদীপ্ত কণ্ঠে কবি বলে ওঠেন "বন্ধু! তোমরা দিলেনাক দাম/রাজ সরকার রেখেছেন মান!/যাহা কিছু লিখি অমূল্য বলে অমূল্যে নেন। আর কিছু/ শুনেছ কি, হুঁ হুঁ, ফিরিছে রাজার প্রহরী সদাই কার পিছু?" তাঁর 'যুগবাণী' (১৯২২), 'বিষের বাঁশী' (১৯২৪), 'ভাঙার গান' (১৯২৪), 'দুর্দিনের যাত্রী' (১৯২৬), 'প্রলয় শিখা' (১৯৩৯), 'চন্দ্রবিন্দু' (১৯৩১) অত্যন্ত সূক্ষ্ম প্রতীকি, ব্যঞ্জনাধর্মী কব্যগ্রন্থ। নজরুলের কবিতা বারংবার না পড়লে প্রাথমিক আপাত অর্থের প্রাচীরেই বাঁধা পড়তে হয়। অর্থকে ধরে কখনও অবহেলা করে, কখনও ব্যজস্তুতিতে চিনে নিতে হয় অন্তর্নিহিত মনার্থ, তবেই রসাস্বাদনের তৃপ্তি জাগে।

নজরুল অপ্রাসঙ্গিক হবেনই বা কি ভাবে? তাঁর কবিতায় নেই কোন ভণ্ডামি, নেই মেকি জীবনের কথা, কবিতা রচনায় সহজাত বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ায় কবি চিনিয়েছেন বাস্তবকে। নিপীড়িত, শোষিত কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে এই মানবতাবাদী শোনান—

"জনগণে যারা জোঁকসম শোষে তারে মহাজন কয়,
সন্তানসম পালে যারা জমি, তারা জমিদার নয়।
মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ,
মাটির মালিক তাহারাই হন—
যে যত ভণ্ড ধড়িবাজ আজ সেই তত বলবান।"

আজও কি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের ভূমিপুত্রেরা কায়িক পরিশ্রম শেষে পান তাঁদের ন্যায্য মজুরী? তবে রূঢ়, কঠিন, বাস্তবই শুধু নয় কবি অনায়াসে বিচরণ করেছেন ভাব, আবেগ, কল্পনার আতিশয্যে। বর্ণ উচ্ছৃঙ্খল, সৌরভ মদমত্ত, গগণভেদী যন্ত্রণা সংবেদনশীল হৃদয়কেও অহরহো ক্ষতবিক্ষত করে। অমর সৃষ্টি 'বিদ্রোহী' কবিতার একাংশেও আমরা খুঁজে নিতে পারি সেই পরিচিত মানুষটিকে।

"আমি বন্ধন হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি,
আমি যোড়শীর হৃদি জীরনিজ প্রেম উন্মাদ, আমি ধন্যি।
আমি উন্মন মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন শ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশীর।"

প্রাচুর্য প্রগলভতা, চিন্তাশীল মন তাঁর লেখার ভারকেন্দ্র। কবির খেয়ালী মনের পরিচয় পাই যত্রতত্র। নজরুলসাহিত্যে সংযম বিধবস্ত হয়ে গড়েছে, কবি যখন হাসেন তখন ধ্বনিত হয় গগনভেদী অট্টহাস্য আবার যখন কাঁদেন তখন সেই অশ্রুরাশিতে বিশ্বপ্লাবন বয়ে যায়। কবি প্রেমে বেহিসেবি, ঘৃণায় উন্মত্ত। যখন কবির অঞ্জলি প্রদানই যথেষ্ট, কবি দেন

বিস্ফারিত অন্তরের উত্তপ্ত কটাহে। কখনও বা এই খেয়ালী চিন্তা অসংযম ও আতিশয্য অর্থের খাঁচা ভেঙে শব্দকে মুক্তি দেয় অর্থহীনতার অন্তরালে। কবিতার এস্‌থেটিকস্‌ যে কবির মননজগৎই নিয়ন্ত্রণ করে তা নজরুল সাহিত্যের পাতা ওল্টালেই বোঝা যায়। নজরুল তাই কোন পৃথক সত্তা নয়, নজরুল এই ধূলি, বালি, কাদারই মানুষ, যাঁর কবিতা এখনও তরুণ যুবকে উদ্দীপিত করে, উজ্জীবিত করে তোলে, যাঁর গান আজও অমলিন, যাঁর রচনা আজও নতুন আলোর পথ দেখায় চলতি গড্ডালিকা স্রোতেও। নজরুলগীতির অধিকাংশই অপূর্ব কবিতার সমাহার বা কবিত্বের এক নতুন জগতকে মেলে ধরতে পারে। নজরুলগীতিতেও আছে সৌন্দর্য ও আনন্দের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। তাই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল কেবল কবিতা, গান, প্রবন্ধ, গল্পে প্রাসঙ্গিক নন, যতদিন ইতিহাস থাকবে, শোষণ থাকবে, বিদ্রোহ বিপ্লব, গণচেতনা থাকবে ততদিন প্রাসঙ্গিক থাকবেন কবি— এ সময়ের দাবি, ইতিহাসের দাবি। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় মেলে নজরুলের চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতারই সফল ও সার্থক অভিজ্ঞান—

"এখনও যদি একটি গান বাতাসে ভেসে আসে—
কিংবা কেউ অনেকদূরে বাজায় মৃদঙ্গ,
তোমার বুকের মধ্যে নাকি হাত রাখেন ঈশ্বর—
মুখের উপর উপচে পড়ে আলোর তরঙ্গ।"

"মাছ-মাংস দূরের কথা জোটেনি ভাত-পিঁয়াজ।
ফুটপাতেতে গণ্‌শার মা ভাবছে খাবে কি আজ ও?
ও জানে না, রাজনীতি কি কিংবা কোথায় গদি কার।
ও শুধু চায়, দু'মুঠো ভাত এবং রুটির অধিকার!
* * *
আলোর মেলায়, খুশীর মেলায় মাইক্রোফোনের উৎপাতে!
দশভুজা দুর্গা হাসেন— দুগ্‌গা কাঁদে ফুটপাতে!!"

—ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

"....শান্তি চাই"

অনুজ গঙ্গোপাধ্যায়

"যুদ্ধ নয় শান্তি চাই" এই স্লোগানটা খুবই সুন্দর, এক কথায় বলা যায় শাশ্বত, চিরন্তন সত্য। প্রকৃতপক্ষে সবাইতো শান্তি চায়, স্থিরতা চায়। ব্যতিক্রম থাকতে পারে থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ব্যতিক্রমীরা অবশ্যই অশুভ চেতনা সম্পন্ন। বিকারগ্রস্ত মানসিক রোগী অথবা মনুষ্যদ্বেষী।

শান্তি চাওয়ার প্রশ্নে সজীব প্রাণীরাই শুধু সচেষ্ট তা নয়, জড় পদার্থের মধ্যেও শান্তি প্রতিষ্ঠার তাগিদ কোনো অংশে কম নয়। মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রচেষ্টা চলবে, শান্তিতে থাকতেই হবে, এটাতো সাধারণ ব্যাপার। খুব সাধারণভাবে বোঝা যায় প্রকৃতিগত কারণেই শান্তি প্রতিষ্ঠা শুধু কাম্যই নয়, অপরিহার্য্য। এখন দেখতে হবে—মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে কতদূর কি হয়েছে বা হচ্ছে এবং হওয়া প্রয়োজন। সন্দেহ নেই প্রচেষ্টা অতীতেও চলেছে— এখনও চলছে।

বেশ একটু পিছিয়ে যাওয়া যাক। দেখা যাবে বাংলার বুকে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। নাম সংকীর্তনকে অবলম্বন ক'রে তিনি এগিয়েছেন। তাঁর এই সংকীর্তনের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিভেদের বেড়াজাল একে স্পর্শ করতে পারে নি। সংকীর্তনকে উপলক্ষ্য ক'রে প্রকৃত শান্তি বা সাম্যের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। একদিকে চলছে "কাজীর বিচার", অন্যদিকে গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণদের অত্যাচার, নিপীড়ন। এই দুঃসময়ে তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টা ছিল নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক। তাঁর এই মিছিলের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতিকর কথা ভেবে অনেকেই তুলনা করতে পারেন (চীনের চেয়ারম্যান) মাও-সে-তুঙের "লং-মার্চ" এর সঙ্গে প্রকৃত পক্ষে ঐ মিছিলের বাস্তবে সার্থক রূপ। এ ব্যাপারে সম্যক বলতে পারেন ইতিহাসের পণ্ডিত ও গবেষকরা। তাঁর প্রচেষ্টায় তিনি অনেকাংশে সফল হলেও তা শান্তিতে করা সম্ভব হয় নি। এর জন্যে তাঁকেও অনেক কিছু জয় করতে হয়েছে কিন্তু এড়িয়ে যেতে হয়েছে প্রয়োজনে ভুলে যেতেও হয়েছে। তা সত্ত্বেও তাঁর উপরে আঘাত এসেছে— অনায়াসে তিনি এসব জয় করেছেন। তবে তিনি যে পরিবর্তনের জোয়ার এনেছিলেন তা— বাংলা সাহিত্যে ও সমাজ জীবনে বিশাল প্রভাব ফেলেছে। বর্তমান সমাজে তাঁর অবদান অমূল্য হলেও তাঁর জীবনের অন্তিম অবস্থা সর্ব সাধারণের কাছে আদৌ সুস্পষ্ট নয়। শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান ও অন্তিম অবস্থার (যা প্রচলিত আছে— সম্পূর্ণ বিপরীত) মূল্যায়ন করতে পারেন সমাজবিদ, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকেরা। অতএব, শান্তি চাইবো আর মিলবে শান্তিপূর্ণভাবেই এটা দুরাশা ছাড়া কিছু নয়।

একটু এগিয়ে এসে আমরা দেখবো রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রয়াস। তাঁদের উদ্দেশ্যও ছিল জীবনমুখী। ঐ সময়ে আধ্যাত্মিকতাকে আশ্রয় করা ছাড়া উপায় ছিল না, তাই তাঁরা ঐ পথকে অবলম্বন ক'রে এগিয়েছেন। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য এক অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদের বেড়াজাল ভেঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা। চিকাগো শহরে বক্তব্য রাখা, বিভিন্ন পুস্তক রচনা বা বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্যের মাধ্যমে বিবেকানন্দ শান্তি বা সাম্যের মাধ্যমে সমাজকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এখানেও সাফল্য সম্পূর্ণ হয় নি উপযুক্ত বা সঠিক চেতনাবোধের অভাবে। তবে এই প্রয়াস কখনই ব্যর্থ নয়। আজও তাঁদের প্রয়াসকে অস্বীকার করা যাবে না। এক্ষেত্রেও তাঁদেরও অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে বিভিন্নভাবে। এমনকি বৃটিশ ও মার্কিন গোয়েন্দাদের কাছে সন্দেহের পাত্র ছিলেন তাঁরা। তাঁদের অবদান কতটা বাস্তব ও গভীর সেটা বুঝতে সহজ হবে সঠিক মূল্যায়ণের উপর।

তাঁর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে দূরে সরিয়ে রেখে আধুনিক কালের মধ্যে আমরা ভাবতে পারি এটুকু মহাত্মা গান্ধীর কথা। বলতে পারা যায় যে তাঁর "হরিজন, ..." স্লোগানের অর্থ নিশ্চয়ই ছিল সাম্প্রদায়িকতা, জাতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে, তাঁর এই স্লোগানকে কিছু রাজনৈতিক দল, অরাজনৈতিক সংস্থা এবং ব্যক্তিত্ব বাস্তবে রূপায়িত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এখনও প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু লাভের অংশ— একেবারেই নয় বললে ভুল হবে, তবে বলবার মতো কিছুই নয়। হয়তঃ কোনো কোনো প্রদেশে কিছু কিছু উন্নতি হলেও ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করে নি— এটা বলতে বাধা নেই।

আমাদের দেশের কথায় আলোচিত হ'ল। বিদেশের মধ্যে রাশিয়ার একটু আলোচনা আবশ্যক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অত্যাচারী 'জার' শাসনতন্ত্রের কবল থেকে রাশিয়া মুক্ত হয় মহান লেনিনের নেতৃত্বে। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের করালগ্রাস থেকে রাশিয়াকে রক্ষা করেন, সোভিয়েত রাশিয়ার রূপকার যোশেফ স্তালিন। রাশিয়া তথা সোভিয়েত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনেকাংশে। কোনো কিছুই চরম হওয়া সম্ভব নয়— তাই এক্ষেত্রেও চরম বা পরমের প্রশ্ন আসেনা। কিন্তু পঞ্চাশ বছরও অতিক্রম করে নি, সোভিয়েত ভেঙ্গে গেল, শান্তি বিঘ্নিত হলো। সোভিয়েতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'তে রক্ত কিছু কম ঝরে নি, ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণও কোনো অংশে কম ছিল না।

রাশিয়া বা সোভিয়েতে শান্তি স্থায়িত্ব লাভ করেনি উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে। রক্ষকই ভক্ষক হ'য়ে যা করবার করল— শান্তি শেষ।

এই সব আলোচনা থেকে বোঝা যায়, শান্তি চাইলেই পাওয়া যায় না;আর পেলেও রক্ষা করা সহজসাধ্য নয়। এবার আসা যাক যুদ্ধের প্রসঙ্গে। যুদ্ধের সংজ্ঞা কি— সেটাই জানা দরকার। শুধুমাত্র রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘাত এটাই কি যুদ্ধের একমাত্র সংজ্ঞা? না কোনো অবক্ষয়কে, অশুভ মানসিকতাকে সহজভাবে দখল করা সম্ভব না হ'লে ; বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সমাধানে আসতে হয়— সেটাও যুদ্ধের রকমফের এই আঙ্গিকে দেখলে, শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধ অপরিহার্য্য। বিনা যুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না— যেখানে অন্তঃহীন বৈষম্য বিরাজমান।

পৃথিবীতে বহু রাষ্ট্র আছে। আছে বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক কাঠামো। কোথাও গণতন্ত্র (তার আবার ভাগ আছে) কোথাও রাজতন্ত্র, কোথাও সমাজতন্ত্র ... ইত্যাদি। এইরকম বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক কাঠামো বর্তমান থাকলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান থাকতে বাধ্য। আর ঐ প্রতিরক্ষার ব্যয়-বরাদ্দ থেকে শুধুমাত্র সৈনিকদের বেতন ইত্যাদির সুরাহা হয়, তাছাড়া সবটাই মানুষের ক্ষতিসাধন করতে পারে কিন্তু উপকারে লাগে না। কয়েক বছর আগের একটি সমীক্ষায় বেরিয়েছিল, প্রতি বছর প্রতিরক্ষাখাতে যে পরিমাণ অর্থ সারা বিশ্বে ব্যয় অর্থে অপচয় হয়, সেই পরিমান অর্থে অন্ততঃ ছয় বছর পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মুখে পরিমিত খাদ্য দেওয়া সম্ভব। যা হোক্, বিভিন্ন তান্ত্রিক শাসন কাঠামো বর্তমান থাকলে আন্তঃরাষ্ট্রিয় ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। অতএব একতান্ত্রিক বা একই ধরনের শাসন কাঠামো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রকৃত সমাজতন্ত্রকে প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে। অন্ততঃ বিনা সংগ্রামে বা বিনা বিপ্লবে এটা নেহাৎই অসম্ভব। তাই যুদ্ধকে পরিহার করা সম্ভব হচ্ছে না শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে।

এটাতো আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের অবস্থা। দেশের মধ্যে বৈষম্য দূর করা আবশ্যক অন্যথায় শান্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। এই বৈষম্য দূর করা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সম্ভব হ'লে অনেক আগেই আমাদের দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হত। এই বৈষম্য দূর করতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈষম্য আরও বাড়িতে দেওয়া হচ্ছে। বৈষম্য দূরীকরণে যাকিছু আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয় তাও ব্যবস্থাগত ত্রুটির জন্যে অনেকাংশে ব্যর্থ থেকে যায়।

প্রবৃত্তির কথা উঠলে আমাদের মাথা নত হয়ে যায়। কারণ বিংশ শতকের একদম শেষে দাঁড়িয়ে আজও নক্কারজনক ঘটনার বিবরণ আমাদের শুনতে হয় ও দেখতে হয়। দৈনিক সংবাদপত্রের পাতা খুললেই পাওয়া যায়— যুবতীকে গণ ধর্ষণ, কিশোরীকে ধর্ষণ। এমনকি নাবালিকাকে ধর্ষণের খবর পাওয়া যায়। এছাড়া আছে খুনের ঘটনা। মা ও বাবাকে খুন, স্বামী বা স্ত্রীকে খুন, ঠাকুমা বা দিদিমাকে খুন, ভাই, বোন বা দাদাকে খুন ইত্যাদি। এসব খুনের মধ্যে অনেক খুনই মহাকাব্যীয় যুগের হত্যাকে লজ্জা দেয়। এক কথায় বলা যায় বর্বরতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সমস্ত মানুষের মধ্যে কত অংশের এই বৈশিষ্ট্য প্রকট আছে বলা না গেলেও এটা বলা যায় প্রকট ও প্রচ্ছন্নভাবে এই আদিম বর্বরপ্রবৃত্তি বেশ একটা সংখ্যকের মধ্যে আছে। আরও একটা সংকট আছে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সেটা রাষ্ট্রনায়ক বা সমমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের রুচি ও স্বভাব চরিত্র সম্পর্কিত।

অনেক রাষ্ট্রনায়ক বা সমমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগের খবর পাওয়া যায়। অর্থ তছরূপ, নারীঘটিত কেলেঙ্কারী, নিজ দল বা বিরোধী দলের নেতা খুন আবার কোথাও দেশদ্রোহিতা। আর একটা অভিযোগ তো আছেই— স্বজন-পোষন ও বিরোধী নিপীড়ন। এখন এটা অবশ্য অনেকটা গা সওয়া হয়ে গেছে।

অলোচনার অবকাশ কম, ইতিমধ্যেই সীমা অতিক্রান্ত তাই স্বল্প পরিসরেই সমাপ্তির রেখা টানতে হবে। "শান্তি চাই"

এই শাশ্বত, চিরন্তন সত্যকে অর্জন করতে হ'লে অনেক কিছুই করা প্রয়োজন। মিটিং, মিছিল, ট্যাবলো ব্যানার, পত্র-পত্রিকায় লেখার প্রয়োজন তো আছেই, কিন্তু এটুকুতে— "শান্তি' প্রতিষ্ঠিত হয় না। তবে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এগুলো প্রাথমিক এবং অপরিহার্য পদক্ষেপ। এছাড়া, 'শান্তি' প্রতিষ্ঠার জন্যে কিছু যুদ্ধের প্রয়োজন আছে। এ যুদ্ধ— বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, প্রকৃত সমাজবাদের পক্ষে যুদ্ধ, বর্বর বা অসৎপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা আঞ্চলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সমস্ত সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সুস্থ চেতনার স্বপক্ষে যুদ্ধ।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধ অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কিন্তু কোন কারনেই পারমাণবিক যুদ্ধ নয়। পারমানবিক যুদ্ধ মানুষ জাতির কাল-শত্রু। বিশ্ববাসীর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা আছে— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা। পারমাণবিক বোমাতে যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে— তার থেকে α, β এবং υ রশ্মি নির্গত হয়। এর মধ্যে υ রশ্মির ভেদন ক্ষমতা এবং ক্ষতিকরণ ক্ষমতা প্রায় অনন্ত বলা যায়। এত সর্বনাশা যে, হিরোসীমা ও নাগাসাকিতে বোমা বিস্ফোরণের ৫০ বছর পরেও নবজাতক এবং নবজাতিকাদের বেশ একটা অংশ এখনও সেই ক্ষতিকে শারীরিকভাবে বহন করছে। মর্মান্তিকতার চরম অবস্থা স্মরণ করেই প্রতিবছর "হিরোসীমা দিবস" পালন করা হয়। তৎসত্ত্বেও এই নিষ্ঠুরতাকে শেষ না করে কয়েকটি দেশ পরীক্ষামূলকভাবে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। ভূ-গর্ভেই হোক বা সুমদ্রগর্ভেই হোক, এই সর্বনাশা তেজস্ক্রিয় পদার্থ সর্বনাশ থেকে মুক্তি দিচ্ছে না। হয়তঃ প্রভাব কিছু অল্প হতে পারে। পারমাণবিক বোমার মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় পদার্থকে মৃত্যুর দূত না করে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে বা অন্য কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করলে শান্তি তথা মানব উন্নয়নে নতুন মাত্রা এনে দেবে। এটাই কাম্য। যারা অনায়াসে "হিরোসীমা" ও 'নাগাসাকি" নামক দুটো শহরকে পারমাণবিক বোমার সাহায্যে ধ্বংস করতে পেরেছিল; আর যে বা যারা নির্বিচারে শত শত মানুষকে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে মারতো তাদের বা তাদের উত্তরসুরীদের সেই মানসিকতাকে ধ্বংস করতে যুদ্ধ অবশ্যই অপরিহার্য। তাই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে যুদ্ধের অবশ্য প্রয়োজন; অন্যথায় "শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস"।

"আমি তোমাদের জন্য কী রেখে গেলাম?
শুধু একটি মাত্র জিনিস
আমার স্বপ্ন—
একটি সোনালি স্বপ্ন
এক শুভ মুহূর্তে আমি প্রথম এই স্বপ্ন দেখেছিলাম।
সেই সব স্বপ্ন এখনও বাতাসে উড়ে বেড়ায়,
শোনা যায় নিঃশ্বাসের শব্দ
আর সব মরে, স্বপ্ন মরে না—
অমরত্বের অন্য নাম হয়।"

—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

জিন ক্লোনিং কি ভবিষ্যতে ফ্রাংকেন্‌স্টিন হবে ?

ডঃ স্বপন কুমার দাস
প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

আর মাত্র কয়েকদিন, ঠিকঠাক বললে মাস দুয়েক পরেই নতুন বছরের মুখ দেখব আমরা। এটা কোনও নতুন ঘটনা নয়। পুরোনো বছর শেষ হয়, নতুন বছর শুরু হয়। মানুষ যখন থেকে দিনক্ষণ, মাস বছরের হিসেব রাখতে শুরু করেছে, তখন থেকেই চলছে এই নিয়ম। এই গ্রহে যতদিন আমরা থাকব, ততদিনই চলবে এ রকম।

তবুও এই বর্তমান বছরটির অন্য একটা তাৎপর্য আছে। এ শুধু একটি বছরের শেষ নয়, এক শতাব্দীর শেষে অন্য এক শতাব্দীতে পদার্পণ। প্রত্যেক শতকের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। এই বিংশ শতক, যার শেষ লগ্নে দাঁড়িয়ে আমরা নতুন শতাব্দী, বরং বলা ভাল নতুন এক সহস্রাব্দকে বরণ করতে মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছি, তা কী দিয়ে গেল আমাদের? এই হিসেব নিকেশ করার সময় এসেছে। বিংশ শতাব্দীকে এক কথায় বিজ্ঞানের অগ্রগতির শতক বললে খুব একটা ভুল হবে না। আমাদের পারিপার্শ্বিক, পরিমণ্ডলের সব ঘটনাকে যুক্তি আর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতা দিয়ে বিচার করার ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল, আরও শ-দুয়েক বছর আগে, কিন্তু যে গতিতে বিজ্ঞানের কর্মকাণ্ড আগের দু-তিন শতকে এগোচ্ছিল, বিংশ শতাব্দীতে তা যেন অবিশ্বাস্য বেগে এই জগত সংসারকে দোলাতে থাকে। বলতে কি শেষের দু-তিন দশকের এমন একটা দিনও বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেদিন কোনও নতুন তত্ত্ব, কোনও নতুন তথ্য অথবা কোনও নতুন প্রযুক্তি কৌশল আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে নি।

"ডলির" জন্ম এমনই এক চমকপ্রদ ঘটনা। ডলি কোনও আজগুবি, প্রাগৈতিহাসিক কিংবা গ্রহান্তরের কোনও জীব নয়। নেহাত এক নিরীহ মেষশাবক। এর চেহারা চরিত্রে কোনও বৈশিষ্ট্যই নেই। তবু ডলির জন্ম নিয়ে অদ্ভুত এক আলোড়ন উঠল বিজ্ঞানীমহলে। কেউ বললেন, "বন্ধহোক এইসব সৃষ্টিছাড়া কাজকর্ম।" অন্যপক্ষ ধমকে উঠে বললেন, "এখনই হয়েছে কী, এরপর আমরা ইচ্ছেমত গাছপালা, পশুপাখি, মানুষও তৈরি করব।"

ব্যাপারটা খুলেই বলা যাক। দেখতে কিংবা আচার ব্যবহারে ডলিকে যতই আর পাঁচটা সাধারণ ভেড়ার ছানার মত দেখাক, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে একদল বিজ্ঞানীর বহু দিনের বিনিদ্র সাধনা। ডলির অনন্যতা তার জন্ম রহস্যে। অন্য চার পাঁচটা ছানার মত ডলি মায়ের ডিম্বাণু বা "এক সেল" থেকে জন্মায় নি। আর প্রকৃত অর্থে ডলি পিতৃহীন। সব রহস্যের কেন্দ্র এই জায়গায়। এতদিন পর্যন্ত জানা ছিল, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি থেকে শুরু করে মানুষ, সবার জন্ম বৃত্তান্ত একই ধারায় চলে। মায়ের শরীর থেকে সৃষ্টি হয় ছোট্ট একটি ডিম্বাণুর। জরায়ুর ভেতরে অপেক্ষায় থাকে ডিম্বাণুটি, কখন আসবে সেই মুহূর্ত। লক্ষ লক্ষ শুক্রাণু ছুটে আসবে তার দিকে, সার্থক করবে তাকে। এক সময়ে শেষ হয় প্রতীক্ষার পালা। ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয় একটি শুক্রাণু। আর তার পরে আরম্ভ হয় এক জটিল সুশৃঙ্খল অথচ অপূর্ব ছন্দোময় কর্মকাণ্ড। এরই পরিণতিতে আলোর মুখ দেখে একটি শিশু, একটি নতুন প্রাণ। মনুষ্যেতর প্রাণীর বেলাতেও জন্মবৃত্তান্তের ছকটি একই। যুগযুগান্ত ধরে চলে আসছে নতুন প্রাণসৃষ্টির এই সনাতন বৃত্তান্ত।

ছোট্ট শিশুর এক সরল প্রশ্ন, 'এলেম কোথা থেকে?' মায়ের উত্তরটাও এক চিরন্তন সত্যের অভিনব প্রকাশ, "ইচ্ছে হয়ে ছিলিস আমার মনের ভিতরে।" ডলির বেলায় ব্যাপারটা কেমন যেন বিপরীতধর্মী। ডলির জন্মের সূত্রপাত তার মায়ের ডিম্বাণু থেকে নয়, একটি দেহকোষ থেকে। ঠিক এই জায়গাতেই ডলি অনন্য।

বিষয়টি আর একটু তলিয়ে দেখা যাক। আমাদের এক তারৎ পশুপাখি আর গাছপালার শরীর লক্ষ কোটি সূক্ষ্ম কুঠরীর মত জিনিস দিয়ে তৈরি। বিজ্ঞানীরা এগুলোকে "কোষ" বলে থাকেন। কোষগুলি এত ছোট যে খালি চোখে দেখা যায় না, অনুবীক্ষণ যন্ত্র বা মাইক্রোস্কোপের সাহায্যেই এগুলোকে দেখা সম্ভব। আমাদের শরীরে যেসব অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গ তা সে হাত-পা, চোখ-মুখ-কান কিংবা ভেতরকার যন্ত্র— হার্ট-লিভার-কিডনি, সবই কোষ দিয়ে তৈরী। আবার এই কোষের মধ্যে রয়েছে একটা গোল বলের মত অংশ, যার নাম নিউক্লিয়াস। বহুদিন ধরেই জানা ছিল যে মানুষ এবং অন্যসব জীবের আকার আকৃতি কিংবা স্বভাব চরিত্র নির্ধারণকারী জিনগুলো সাজানো থাকে সুতোর মত অংশ বা 'ক্রোমোজোমে'। ক্রোমোজোমগুলো আবার থাকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে।

ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস মায়ের শরীর থেকে নিয়ে আসে আমাদের জিন ভাণ্ডারের অর্ধেক। বাকী অর্ধেক আসে বাবার শরীর থেকে শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে দিয়ে। ডলির জন্ম কিন্তু মায়ের শরীরের কোষ থেকে, তাতে শুক্রাণুর কোনও ভূমিকাই নেই। সোজা কথায় এটাই হল জিন ক্লোনিং-এর প্রকৌশল। এইভাবে সোজা সরল পথটি না ধরে ইচ্ছেমত এবং প্রয়োজনমত একটি প্রাণীর সৃষ্টি করতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা।

বলতে কি, জীব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটি যে এক উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার তাতে বিশেষ সন্দেহ নেই। সমস্যা কিন্তু অন্য জায়গায়। আজ যা ভেড়ার ছানা নিয়ে করা হল, অদূর ভবিষ্যতে ঐ একই প্রকৌশলের সাহায্য নিয়ে মানুষ বানানো হবে না, তা কে বলতে পারে? আর যদি তাই হয় তাহলে কোন মানুষের ক্লোন বা প্রতিবিম্ব বানানো হবে? আর সেটা ঠিক করবে কে? না বললেও চলে, এসব কাজ করতে গেলে, খরচ হয় প্রচুর। তাহলে তো বিশ্বের ধনী রাষ্ট্রগুলোই ঠিক করে দেবে সবকিছু। কখন, কটি এবং কার প্রতিবিম্ব তৈরী করা হবে, তা নিয়ন্ত্রণ করবে তারাই।

মূল বিতর্ক এই ব্যাপারটাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। কার ক্লোন তৈরী হবে? প্রতিভাধর লেখক— শিল্পী, খ্যাত নামা বিজ্ঞানী অথবা ক্রীড়াবিদ নাকি কুখ্যাত কোনও অপরাধীর? বিজ্ঞানীরা প্রাণপণ পরিশ্রম করে তাঁদের চিন্তাভাবনাকে রূপ দিতে পারেন কিন্তু তার অপপ্রয়োগ ঠেকাবার ক্ষমতা তাঁদের হাতে নেই। এই রকম অপপ্রয়োগের উদাহরণ মিলবে ভুরি ভুরি। এখানে একটিমাত্র উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। আমরা ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছি বেশ কিছু জন্মগত ত্রুটির জন্য খুঁত যুক্ত জিন অথবা ক্রোমোজোমের বিকৃতি দায়ী। আর একটা কথা বুঝতেও বিশেষ অসুবিধে নেই যে এই ধরণের ত্রুটি বা অসুখ সারাবার ক্ষমতা আমাদের নেই। শুধু তো পরিবার নয়, শারীরিক এবং মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী এই সব মানুষের জন্য সমগ্র সমাজের দায়িত্ব রয়েছে। এই জন্যই চিকিৎসকেরা যাতে এরকম প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম না হয় তার জন্য নানা প্রতি বিধানের কথা বলে আসছেন। এর মধ্যে একটি হল 'অ্যামনিওসেন্টেসিস'। বেশ বড়সড় আর খটমটে নামের এই প্রযুক্তিটি কিন্তু খুব সোজা সরলও নয়, বেশ ব্যায়সাপেক্ষও বটে।

মায়ের গর্ভে ভ্রূণটি যখন বেশ পরিণত হয়, তখন সেটি থাকে তরলে পূর্ণ একটি থলির মধ্যে। থলিটির নামই অ্যামনিয়ন আর তরলটিকে বলা হয় 'অ্যামনিয়টিক ফ্লুইড'। ভ্রূণের কিছু দেহ কোষ ভেসে থাকে ওই ফ্লুইডের মধ্যে। অ্যামনিওসেন্টেসিস এমন একটি পদ্ধতি যাতে অতি সতর্কভাবে সূক্ষ্ম এক সিরিঞ্জের সাহায্যে অল্প একটু ফ্লুইড আর তার মধ্যে ভেসে থাকা গুটিকয় কোষ টেনে নেওয়া হয়। এরপর ঐ কোষগুলো পরীক্ষা করে বলে দেওয়া সম্ভব যে শিশু জন্মাতে যাচ্ছে তার মধ্যে ক্রোমোজোম সংখ্যার কোনও হেরফের আছে কি-না অথবা ক্রোমোজোমে আদৌ কোনও বিকৃতি আছে কি না। যদি কেমন কোনও গণ্ডগোল থাকে তাহলে ওই বিকলাঙ্গ সন্তান যাতে না জন্মায় তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

এর উদ্দেশ্য যে মহৎ তা সকলেই স্বীকার করবেন। এবার এই পদ্ধতির অপ্রয়োগ অথবা অসৎ উদ্দেশ্য প্রয়োগের ব্যাপারটিতে এক ঝলক নজর ফেরানো যাক। অ্যামনিওসেন্টেসিসের মাধ্যমে গর্ভস্থ শিশুটি পুত্র কিংবা কন্যা তাও বোঝা যায়। বিপদ এখানেই। আমাদের দেশে এখনও মেয়েদের ওপর নাম 'বোঝা' আর ছেলে হলে বংশরক্ষার সঙ্গে বাবা-মার মনোবাঞ্ছা 'পূর্ণ' হয়। হয়তো সমাজের আলোকিত অংশে এই সমস্যা তত বেশি প্রগাঢ় এবং প্রকট নয়, কিন্তু এদেশের প্রত্যন্ত অংশে এই সমস্যা (অথবা সামাজিক ব্যাধি) আজও প্রবল। দিন-আনা, দিন খাওয়া মানুষ হয়তো 'পণপ্রথার' ভয়ে কন্যাশিশুকে পরিত্যাগ করে। এটা নিশ্চয়ই অমানবিক। ধনী অথচ 'অন্ধকারের' বাসিন্দারা একধাপ এগিয়ে কন্যাভ্রূণটিকে মাতৃজঠরেই বিনাশ করে দেয়। এটা বোধহয় আমাদের সবার কলঙ্ক। বিজ্ঞান তো সত্যের

পূজারী। তার আসল উদ্দেশ্যই হল সমাজ, দেশ তথা বিশ্বের মানব কল্যাণ। অথচ কিছু সংস্কারাচ্ছন্ন আর অমানুষের হাতে তা কী ধরনের নারকীয় কাণ্ড ঘটাতে পারে, এটা তারই নিদর্শন।

'অ্যামনিওসেন্টেসিস' নিয়ে যা চলেছে, জিন ক্লোনিং নিয়েও যে সে রকম কিছু হবে না, তা কে বলতে পারে? ক্লোনিং করে নতুন ধরনের গাছপালা কিংবা জীবজন্তু বানানো যেতে পারে। সৃষ্টি করা যেতে পারে সত্যিকারে 'হাঁসজারু' এ পর্যন্ত ঠিক আছে কিন্তু মানুষের ক্লোনিং আবার সেই রূপকথার 'প্যাণ্ডোরার বাক্স' হবে না তো?

এর ফল যে খুব মঙ্গলময় হবেনা, তার ইঙ্গিত কিন্তু ইতিমধ্যেই মিলেছে। আমেরিকার কিছু মহিলা 'ক্লোনিং'-এর মাধ্যমে নিজের দেহকোষ থেকে তৈরী সন্তানের মা হতে চেয়েছেন। হয়তো পুরুষদের তাঁরা একেবারেই পছন্দ করেন না। তা না করুন নারী স্বাধীনতার নামে তাঁদের এই ক্রিয়াকলাপ কি বিবর্তন বা 'এভলুশানের' আনুকূল্য পাবে? একমাত্র সময় ই দিতে পারে এর উত্তর। ভবিষ্যতে কী পাব আমরা— অতিমানব না অতি দানব? লক্ষকোটি বছর ধরে এই পৃথিবীর বুকে যে জৈববৈচিত্র্য বা বায়োডাইভার্সিটি গড়ে উঠেছে, তা কি থাকবে নাকি ক্লোনিং-এর আবদান ফ্রাঙ্কেনস্টিনরা সব কিছু, মায় আমাদের বংশধরদের নিশ্চিহ্ন করে শয়তানের হাসি হাসবে।

"ছিপ খান তিন দাঁড়—
তিনজন মাল্লা
চৌপর দিন ভোর
দ্যায় দুর -পাল্লা!
পাড়ময় ঝোপঝাড়
জঙ্গল— জঞ্জাল,
জলময় শৈবাল
পায়ার টাকশাল।"

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

WORD PREFACE

JYOTISHMAN SAHA
B.Sc., 1st Year

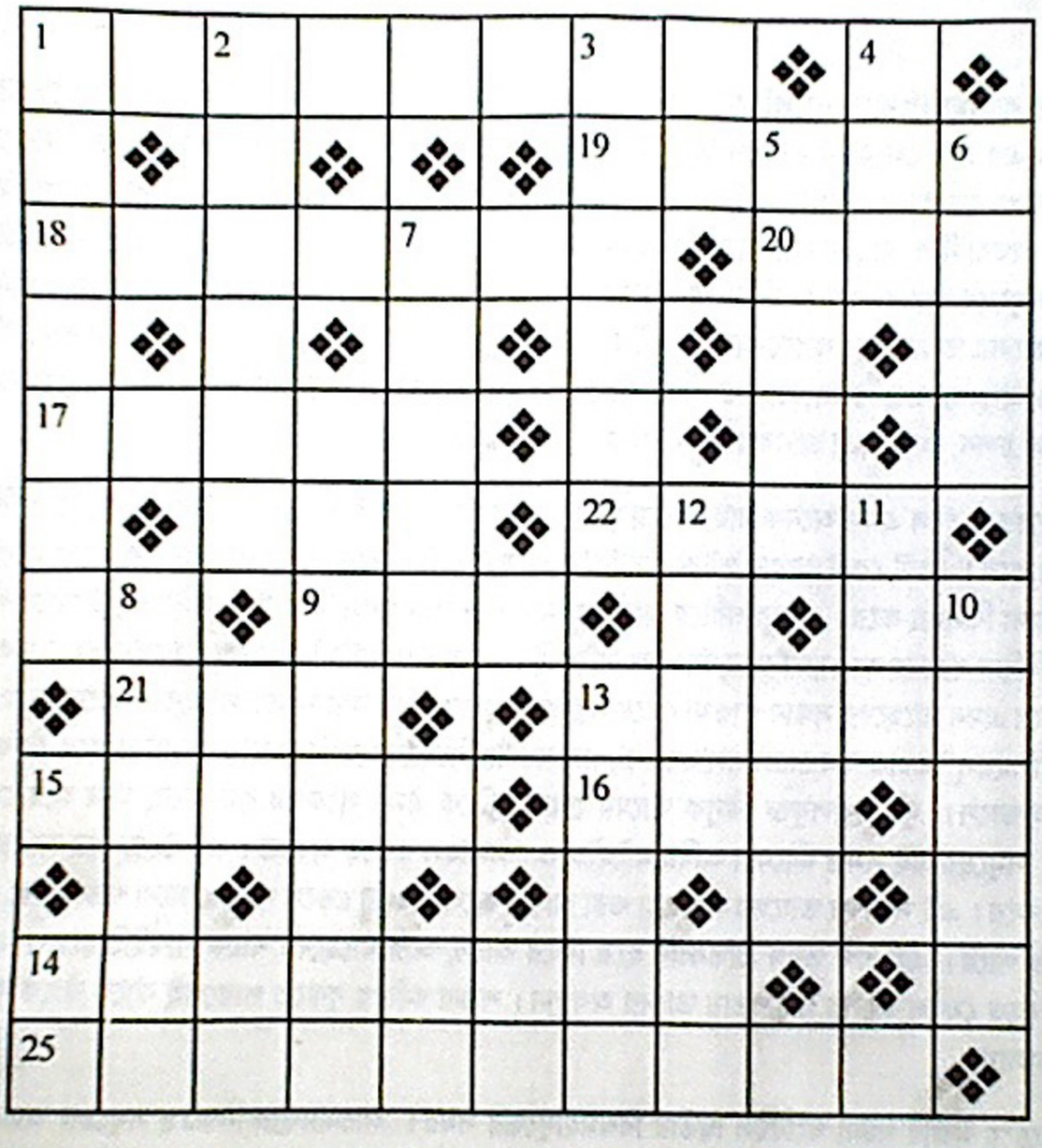

UP-DOWN

(1) A women came from Heaven, (2) Act with Dance, (3) Capital of Portugal, (4) A river/Zero, (5) A tourism, (6) Self doing, (7) Admission, (8) A bike can hunt, (9) Historical Missionary, (10) A cartoon character, (11) A foot of an animal, (12) Listening many times, (13) Duck.

PARALLEL

(1) Important in rain, (9) Vision, (13) You wear in winter, (14) An epic, (15). If you see it you will cry, (16) Personal, (17) hail, (18) Bad human being,(19) A nation/ country, (20) An affair, (21) Night bird, (22) You talk with— (23) Story of Pandaba.

অতল সাগরের কোলাহল

ডঃ পবিত্রনন্দ গঙ্গোপাধ্যায়
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

'সাগর বা সমুদ্রের নাম শুনলেই অনেকে এক কথায় রাজী, বিশেষ করে গরম কালে। প্যাচ পেচে গরম, ঠেলাঠেলি, শহরে হৈচৈ-এর হাত থেকে নিস্তার পেতে অনেকেই হয়ত প্রস্তুত দীঘা, পুরী অথবা গোয়ার সমুদ্র সৈকতে যাবার জন্য। সমুদ্রের অসংখ্য বড় বড় ঢেউ পাড়ের দিকে ছুটে আসতে দেখে অনেকের মন ভরবে, কারও বা টপাটপ ঝিনুক পকেটস্থ করার কাজ অথবা নীল আকাশ আর সমুদ্রের অনন্ত নিস্তব্ধতার স্বাদ পেতে পাড় দিয়ে হেঁটে চলা, না এটাই সমুদ্রের শেষ কথা নয়। সমুদ্রের অতলে রয়েছে বিরাট এক জগৎ। সমুদ্র গর্ভের এই জগতটির রহস্য জানবার জন্য মানুষের কৌতূহল বহুদিনের। জলের তলায় বাস করছে অসংখ্য জীব— রয়েছে নানান ধরনের শ্যাওলা ও উদ্ভিদ এদেরকে "সিক্সোরা" বলে, আর রয়েছে অসংখ্য মাছ, পতঙ্গ, সাপ ও নানান ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী এদেরকে বলে "সি ফনা"। বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের এই জীবদের চাল চলন, কথা বার্তা জানবার জন্যে বহুকাল ধরে ছেষ্টা করছেন।

সাগরের অতলে এমন অনেক মাছ আছে যারা তাদের মধ্যে কথা বিনিময় করে নিজেদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ দিয়ে গা ঘসাঘসি করে। কেউ কেউ আবার পটকার সাহায্যে কম্পন সৃষ্টি করে ঝগড়া করে। আবার এদের মধ্যে অনেকে দাঁতে দাঁত ঘসে কথা বিনিময় করে। এদের শরীরে কারও আঘাত লাগলে দলবল নিয়ে অন্য সঙ্গীরা ছুটে আসে পরিচর্য্যার জন্য। শত্রু এলে বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ করে ভয় দেখায়, তাড়িয়ে দেয় ওদের সীমানা থেকে। জলের তলায় সবচেয়ে গোলমাল ও হৈচৈ করে এমন মাছেদের সন্ধান পাওয়া গেছে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার সংলগ্ন সাগরে— এদের নাম "গ্রান্ট"। সমুদ্র ঘোড়া বা "সিহরস্" এরাও কম গোলমাল করে না, এরা আবার নিজেদের শরীরের হাড় নাড়াচড়া করে একধরনের আওয়াজ করতে ভালভাসে। দুই খোলযুক্ত ঝিনুক তাদের খোল দুটিকে এমন সজোরে বন্ধ করে, মনে হবে ছোটখাট পটকার আওয়াজ। সমুদ্রের এই সমস্ত জীবেরা অবিরাম হৈচৈ ও কোলাহল করতে অভ্যস্ত। এই হৈচৈ-এর আওয়াজ অবিরম শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এই সব শব্দ তরঙ্গের সাহায্যে ওরা আবার জলের ওপর ভেসে থাকা কোনো শত্রু অথবা কোনো খাবারের স্থান বুঝতে পারে। এই শব্দ তরঙ্গ প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে, আর মাছেদের থাকে পার্শ্বইন্দ্রিয়রেখা বা গ্রাহক যন্ত্র তার সাহায্যেই বুঝে ফেলে জলের গভীরতায় তাদের অবস্থান। শত্রুর অস্তিত্ব বুঝতে পারলেই ঝাঁকে ঝাঁকে ন্যাট বিমানের মত আক্রমণ চালায়।

সবচেয়ে মজার ঘটনা ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময়। আমেরিকার নিকটস্থ সমুদ্রের অতলে ছিল ঝিনুকের আস্তানা। এই ঝিনুকের মধ্যে তৈরী হয় মূল্যবান রত্ন যার নাম মুক্তো। আমেরিকার নৌবাহিনীর সেনারা এই রত্নভাণ্ডার পাহাড়া দেবার জন্যে সমুদ্র গহ্বরে বিভিন্ন জায়গায় মাইন বা বিস্ফোরক বোমা পুঁতে রেখেছিল। এই মাইনের বৈশিষ্ট্য এমন ছিল যে শত্রুপক্ষের কোনো ডুবো জাহাজ হঠাৎ আক্রমণ চালালে তার আওয়াজেই সমুদ্রের অতলে বিস্ফোরণ ঘটবে, ফলে নৌ সেনারা শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে। কিন্তু দেখা গেল মাইনসগুলো আপনা আপনি ফাটতে শুরু করেছে। নৌসেনারা প্রথমে ভেবেছিল শত্রুপক্ষ জাপানের ডুবো জাহাজের আওয়াজই ঘটনাটি ঘটিয়েছে, কিন্তু তমতম করে খুঁজেও সাবমেরিনের সন্ধান পাওয়া গেল না। নৌসেনারা এই ঘটনায় খুব অবাক হয়ে গেল। ঘটনাটা নিয়ে তখন তুমুল আলোড়ন পরে যায়। একদল জীব বিজ্ঞানী তখন এগিয়ে আসেন ঘটনার রহস্য জানবার জন্য। বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের অতলের বিভিন্ন আওয়াজ নিয়ে পরীক্ষা চালাতে থাকেন এবং অবশেষে অভিমত দেন অসংখ্য মাছেদের কোলাহলের আওয়াজই এই বিস্ফোরণের কারণ। ভারতে অবাক লাগে মাছেদের জলের তলায় কাণ্ডকারখানা, তাদের হৈচৈ-এর আওয়াজে মাইনস্রেও বিস্ফোরণ ঘটে।

সমুদ্রের অতলে মাছ ছাড়াও আরও বড় ধরনের জীব রয়েছে যার নাম তিমি, আর রয়েছে ডলফিন্স বা সমুদ্র শুশুক। এরা আবার খুব বকবক করতে ভালোবাসে তাই এরা সমুদ্রের বখাটে প্রাণী বলে পরিচিত। এরা যখন দলবেঁধে জলের মধ্যে যায় তখন রীতিমত একটা হৈহল্লোর বেধে যায়। এদের বাচ্চারা আবার চীৎকার করতে ভালবাসে, ওরা চীৎকার করতে করতে ওদের মায়েদের সঙ্গে চলে, কখনও ডুব দিয়ে কখনও মাথাটা জল থেকে উঁচু করে। আবার ডলফিন বা শুশুকদের হাসি আরও বিখ্যাত।

"আমরা এক বৃন্তে ফুল, এক মাঠে দুই ফসল
আমাদের খাঁচার ভিতর একই অচিন পাখির আনাগোনা—
আমার দেবতার থানে তুমি বটের ঝুড়িতে সুতো বাঁধো,
আমি তোমোর পীরের দরগায় চেরাগ জ্বালি।
আমার স্তোত্রপাঠ তোমাকে ডাকে,
তোমার আজান আমাকে খুঁজে বেড়ায়।"

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অনুসন্ধান ও প্রাপ্তি

বুদ্ধদেব হালদার
ভূগোল (সাম্মানিক) প্রথম বর্ষ

তুমি আছ,
আমি অনুভব করছি,
কিন্তু কোথায়?

আমি খুঁজেছি তোমাকে
মিছিলে মিটিং-এ আন্দোলনে।
আমি ছুটেছি গ্রহ উপগ্রহে
শুধু তোমার জন্যে।

উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু
তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছি,
সে তোমাকেই পাবার জন্য।

আমার জনে বাঁয়ে সম্মুখে পিছনে খুঁজেছি
মেলেনি দর্শন তোমার।

তবু তুমি আছ শুধু অনুভবে।
আমি ভেবে পাইনে—
দৃষ্টির আড়ালে যে রয়েছে
তার প্রতি এত টান কেন আমার?

অতপর বিশ্বসংসার ছারখার শেষে ভুল ভাঙ্গল।
আমি খুঁজে পেলাম তোমার অস্তিত্ব।

তখন নিজেকে অনেক বোকা মনে হয়েছিল।
তুমি যে আমার এ-এ-এই খানে—
আমার ছোট্ট হৃদয় জুড়ে
তাতো বুঝিনি আগে।

নব্ ঘোরালেই

অনিন্দ ঘোষ
বাংলা (সাম্মানিক) প্রথম বর্ষ

নব্ ঘোরালেই— মায়াবী বুদ্ বুদ
নব্ ঘোরালেই রক্ত চোষা ভূত
নব্ ঘোরালেই জ্যান্ত প্রেমের দেবী
নব্ ঘোরালেই নীলচে আলোর ছবি।

নব্ ঘোরালেই ভাগ্য লেখা হাত
নব্ ঘোরালেই কেবল রক্ত পাত
নব্ ঘোরালেই কোক্ পেপসির ক্যান
নব্ ঘোরালেই র‍্যামবো জ্যাকি চ্যান।

নব্ ঘোরালেই হাল ফ্যাসনের সাজ
নব্ ঘোরালেই স্বল্প বাসের নাচ
নব্ ঘোরালেই কেব্‌ল চাই চাই
নব্ ঘোরালে নষ্ট হয়ে যাই।

নবের মধ্যে উপগ্রহ থাকে
নব্ ঘোরালেই মৃত্যু এসে ডাকে।।

জীবনানন্দ দাশ

অনন্য ভট্টাচার্য্য
উদ্ভিদ বিদ্যা (সাম্মানিক) দ্বিতীয় বর্ষ

তুমি সুন্দর নও
তবে তোমার সৃষ্টি সুন্দর
তোমার কালো চোখ দিয়ে—
সবকিছু দেখেছ নতুন ভাবে, নতুন সাজে
কলম দিয়ে এঁকেছ ছবি বাংলার পথ-ঘাট
শঙ্খচিল, শালিক কিংবা ধানসিড়ির তীর,
কিশোরীর রাঙ্গা পা, বাংলার প্রান্তর
বণলতা সেন— সুরঞ্জনা
সবকিছুতেই তোমার সুন্দর বোধের বহিপ্রকাশ
মৃত্যুকে ভালবেসেছিলে, তাই
মৃত্যু বুঝি কেড়ে নিল তাড়াতাড়ি
ছিলে তুমি পুনর্জন্মে বিশ্বাসী
ভালবেসেছিলে বাংলার পথ-ঘাট
বলেছিলে "আবার আসিব ফিরে"
ফিরে কি এসেছ?
যদি আস—
আমি অভ্যর্থনা জানাবো
যখন হবে তোমার বহিঃ প্রকাশ
আশাকরি কাক, চিল হয়ে নয়
'মানুষ হয়েই, ফিরবে তুমি
প্রকৃতি প্রেমিক জীবনানন্দ দাশ।

অন্তরীণ

অভ্রদীপ মুখার্জী
প্রাণীবিদ্যা (সাম্মানিক) দ্বিতীয় বর্ষ

কতবার চেয়েছি বোঝাতে
তোমাকে—।
চোখে শুধু প্রশ্ন ভ'রে,
উত্তরের প্রতীক্ষায়
তোমার নিদ্রিত মুখের ছবি
চোখের সামনে রেখে,
সাহারার বালুকণার মধ্যে ঝরে পড়া
এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দুর
মতো শুধু খুঁজেছি—
উত্তর।

কতবার চেয়েছি বোঝাতে
তোমাকে—।
রাতভর রৌদ্রস্নান করে,
উত্তরের প্রতীক্ষায়
তোমার গৈরিক গন্ধ
প্রশ্বাসের সঙ্গে বুকে টেনে,
মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়া
একটা তীব্র নক্ষত্রের
মতো শুধু খুঁজেছি—
উত্তর।
কতবার চেয়েছি বোঝাতে
তোমাকে—।
বুকে ফুলের উল্কি করে,
উত্তরের প্রতীক্ষায়
তোমার স্বপ্ন ভিজিয়ে রেখে
জিইয়ে রেখে চূর্ণ বসন্ত,
গভীর জলে হাত বাড়িয়ে
তুলে আনতে চাই
যে মুক্তো তার
মতো শুধু খুঁজেছি—
উত্তর।

তোমার ও দুটো ভীষণ সহিষ্ণু চোখ
আমাকে জ্বালায় পোড়ায়, ঝাপ্সা করে দৃষ্টিপট।
মুড়ে রাখে আমায় ক্ষয়িষ্ণু শোক।
চোখ মেলে শব্দের গভীরে কী দেখ
সযত্নে অন্তরীণ তুমি?
আমি ভাঙন বাঁকে কাঁদতে থাকি,
জ্বলতে থাকি শাওন বাঁকে।
ভাবনার চিত্রকলা রোষের তাপে
গলতে থাকে, ঝরতে থাকে—
বাজতে থাকে, নাচতে থাকে—
তবুও—
তোমায়, তোমার ছবিকে
আলতো আদরে ছুঁয়ে যাই।
রাতভর মুখ পুড়িয়ে আমার প্রাণের ছবিকে
ধরে রাখি
আরক্ত নয়নে।

Don't Quit

Paromita Mukherjee
Ist year, Sociology (Hons.)

When things go wrong,
as they sometimes will
When the road you're trudging,
seems all uphill,
When the funds are low,
and the debts are high,
And you want to smile,
but you have to sigh,
When care is pressing you down a bit—
Rest if you must, but don't you quit.

Life is queer with its twists and turus
As everyone of us sometimes learns,
And many a fellow turns about
When he might have won had he stuck it out.
Don't give up though the pace seems slow—
You may succeed with another blow.

Often the goal is nearer than
It seems to a faint and faltering man ;
Often the struggler has given up
When he might have captured the victors' cup;
And he learned too late
When the night came down
How close he was to the golden crown.
Success is failure turned inside out—
The silver tint of the clouds of doubt,
And you never can tell how close you are,
It may be near when it seems after.
So stick to the light when you're hardest hit—
It's when things seem worst that you mustn't quit.

ফিরে আসা পতঙ্গ বাহিত রোগ

ডঃ সজল ভট্টাচার্য

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

মারীগুটিকা (Small Pox) পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। এ পৃথিবীকে পোলিও মুক্ত করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী চলছে। সেদিন আর খুব বেশী দূরে নয় যেদিন এ পৃথিবী পোলিও মুক্ত হবে। কিছু পতঙ্গবাহিত রোগ যেমন কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া আমাদের দেশ থেকে প্রায় বিদায় নেওয়ার মুখে এসে গিয়েছিল। ১৯৫০ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে ভারতে কালাজ্বরের কথা প্রায় শোনাই যায় নি। দুদশকের নীরবতার পর উত্তর বিহারে কালাজ্বরের প্রত্যাবর্তন ঘটল ব্যাপক মহামারীর আকারে। সত্তরের দশক থেকেই এখনো পর্যন্ত বেশ কয়েক লক্ষ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। মৃত্যুও হয়েছে বেশ কয়েক হাজার মানুষের। পার্শ্ববর্তী রাজ্য বাংলাও আছে এই রোগের কবলে।

পঞ্চাশের দশকে জাতীয় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ও পরবর্তীকালে জাতীয় ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ পরিকল্পনার সুফলে ষাটের দশকের শুরুতে ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসেছিল। কিন্তু এই দশকের মধ্যভাগ থেকেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ পুনরায় বাড়তে শুরু করল। সত্তর দশকের শুরুতে ম্যালেরিয়া ব্যাপক আকারে ফিরে এল। যেন বাঁধ ভেঙ্গে গেল। ১৯৮১ সালে কলকাতার বুকে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার পুনরাবির্ভাব হয়। প্রায় দীর্ঘ পঁচিশ বছর উধাও হয়ে যাওয়ার পর ম্যালিগন্যান্ট ডেঙ্গুজ্বর কলকাতায় ফিরে আসে ১৯৯০ সালে।

ভারত থেকে প্লেগ নির্মূল হয়ে গিয়েছিল ষাটের দশকের মধ্যভাগে। প্রায় তিনদশক পরে ১৯৯৪ সালে গুজরাটের সুরাটে প্লেগের ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব জনমানসে তীব্র আতঙ্ক ও ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। এই রোগটির সংক্রামণ ঘটিয়ে থাকে র‍্যাটফ্লি নামক পোকা। কালাজ্বরের পরজীবি বহন করে স্যাণ্ডফ্লাই। ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর বাহিকা যথাক্রমে অ্যানোফিলিস ও এডিস মশা।

পতঙ্গবাহিত এই সব রোগ আবার ফিরে এল কেন? স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন আসে। পর্যালোচনা করলেই পরিষ্কার হয় নেপথ্যে কারণগুলো, যেমন পুর্ণাঙ্গ, নিখুঁত ও যথার্থভাবে কীটনাশকের ব্যবহার না করা। কীটনাশকের বিরুদ্ধে বাহিকা পতঙ্গের প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন। প্রতিনিয়ত কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে কিছু প্রজাতির কীটনাশকের বিষক্রিয়া সহ্য করার ক্ষমতা তৈরী হয়। জিনের পরিবর্তনের ফলেই এই প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে মশার প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মেছে, কৃষিক্ষেত্রে যথেচ্ছ কীটনাশকের ব্যবহারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে। ম্যালেরিয়ার ওষুধের বিরুদ্ধে ম্যালেরিয়া পরজীবির প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন ও অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর সংক্রামিত মানুষকে সঠিকভাবে সনাক্ত করা ও তাঁদের চিকিৎসা সম্পূর্ণভাবে ধরতে না পারার ফলে তাঁদের দ্বারা রোগগুলো অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে। তত্ত্বাবধান পদ্ধতিও অপ্রতুল। নজরদারীতেও খুঁত আছে। অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও পরিবেশ অনুকূল প্রজাতি না হওয়ার কারণে পতঙ্গের পরিবেশ ও ব্যবহারের পরিবর্তন হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে সংক্রামিত অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রোগজীবাণু বহন করেন। বিমান, জাহাজ, রেল, আন্তঃরাজ্য পরিবহনের মাধ্যমেও এইসব সংক্রামিত পতঙ্গ বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে। স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম এমন মানুষজন রোগের পুনরাবির্ভাবে আক্রান্ত ও হন বেশী। সঠিক সময়ে রোগ সনাক্ত না হলে কিংবা অসম্পূর্ণ চিকিৎসা হলে আক্রান্ত রোগীর দ্বারাও পতঙ্গ সংক্রামিক হয়ে রোগ ছড়িয়ে থাকে। পতঙ্গবাহিত এই রোগসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক টীকা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রশাসন, আপামর জনসাধারণ, বিভিন্ন সমাসজসেবী সংগঠন প্রভৃতির সমবেত ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় গৃহীত এক সার্বিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ফিরে আসা পতঙ্গবাহিত রোগসমূহকে এ পৃথিবী থেকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে, যেমন সম্ভব হয়েছে ইউরোপ অষ্ট্রেলিয়া থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল করা যদিও কম হলেও সেখানে মশা আজও বর্তমান।

শব্দসন্ধানের উত্তর
SOLUTION

PARALLAL

1) Umbrella
9) Eye
13) Shawl
14) Ramayana
15) Onion
16) Won
17) Steel
18) Vulgers
19) India
20) Ilu
21) Owl
22) Leap
23) Mahabharat

UP-DOWN

1) Urvashi
2) Ballet
3) Lisbon
4) Nil
5) Digha
6) Auto
7) Entry
8) Honde
9) Elora
10) Alice
11) Paw
12) Echo
13) Swan

COLLEGE LIBRARY

"মুক্তির মন্দির সোপান তলে
কত প্রাণ হল বলিদান
লেখা আছে অশ্রুজলে"...

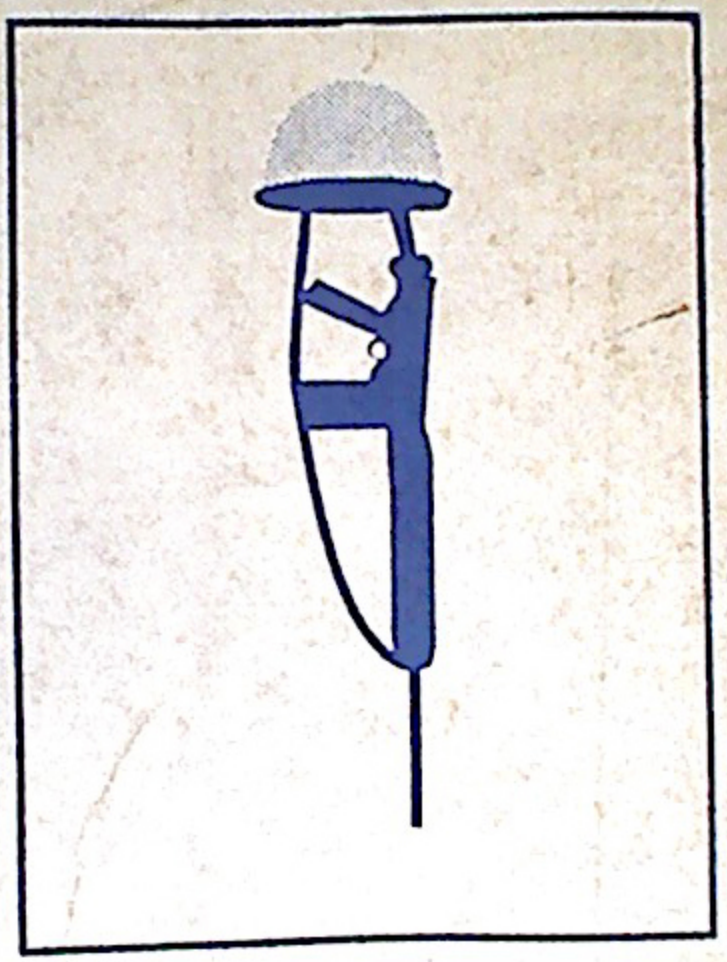

কারগিল সংঘর্ষে শহীদ বীর সেনানীদের
আত্মাহুতিতে আমরা গর্বিত, অনুপ্রাণিত।

মুদ্রণে সৌরভ প্রিন্টার্স, কলকাতা-২৬